৩

স্বামী বিবেকানন্দ

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদান (Life and achievement in short)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লিতে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বিদ্যালয় এবং কলেজ-জীবন তেমন ঘটনাবহুল নয়। তবে সাফল্যের সঙ্গে তিনি কলেজ স্তরের পাঠ সমাপ্ত করেন। বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। শিক্ষার এই দুটি দিকেই তিনি সমান পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শন। ফলে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই দুই আপাত বিপরীত ভাবধারার তুলনামূলক বিচারে তরুণ বয়সেই তিনিই যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শুরুর দিকে তাঁর মধ্যে সংশয়বাদী ভাবনার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি অতঃপর জগতের কাছে পরিচিত হন 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসেবে ভারতের নানা প্রান্তের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, আধ্যাত্মিকতার অতি উন্নত উত্তরাধিকারী হলেও, সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হলেও ভারতবর্ষ দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যাধিকে দূর করতে পারেনি। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য দরকার শক্তিশালী এক আধ্যাত্মিক পুরুষের নেতৃত্বে এক আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন। ১৮৯৩-তে তিনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থনে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখে সারা বিশ্বের যুক্তিবাদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে তিনি বিশ্বের নানা দেশে আমন্ত্রিত হয়ে অদ্বৈত বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারা প্রচার করেছেন। ধর্মের জীবন যে কর্মবিমুখ হতে পারে না, সারা জীবন স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অনতিদূরে হাওড়া জেলার বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং তাঁর নেতৃত্বে সামাজিক সংস্কার ও সেবার এক বিপুল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। অজস্র চিঠিপত্র, বক্তৃতা এবং গ্রন্থে ছড়ানো তাঁর দার্শনিক ভাবনা ভাবীকালের জন্য এক অনন্য সম্পদ।

পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের তিনটি মুখ্য বিষয় এখানে আলোচিত হচ্ছে— (i) **ব্যাবহারিক বেদান্ত,** (ii) **বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ** এবং (iii) **যোগচতুষ্টয়।**

৩.১. ব্যাবহারিক বেদান্ত
Practical Vedanta

১৮৯৪ সালের ১৪ নভেম্বর লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণে[১] স্বামীজি 'বেদান্ত দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ' সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেন। স্বামীজি তাঁর ভাষণে সবিস্তারে এ কথাই বলেন যে, **বেদান্ত দর্শন নিছক তত্ত্বগত**

১. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক অনুবাদ ও সম্পাদনা। প্রথম খণ্ড। পৃ- ৫৫২।

৩

স্বামী বিবেকানন্দ

সংক্ষিপ্ত জীবনী ও অবদান (Life and achievement in short)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক ধর্ম ও সমাজসংস্কারক এবং দার্শনিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার সিমলা পল্লিতে। তাঁর পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর বিদ্যালয় এবং কলেজ-জীবন তেমন ঘটনাবহুল নয়। তবে সাফল্যের সঙ্গে তিনি কলেজ স্তরের পাঠ সমাপ্ত করেন। বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চাও তাঁর কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। শিক্ষার এই দুটি দিকেই তিনি সমান পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শন। ফলে ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, দর্শন এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই দুই আপাত বিপরীত ভাবধারার তুলনামূলক বিচারে তরুণ বয়সেই তিনিই যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শুরুর দিকে তাঁর মধ্যে সংশয়বাদী ভাবনার উপস্থিতি ছিল। কিন্তু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ নরেন্দ্রনাথের জীবনে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। তিনি অতঃপর জগতের কাছে পরিচিত হন 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসানের পরে স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক হিসেবে ভারতের নানা প্রান্তের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। পরিব্রাজক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর এই উপলব্ধি হয় যে, আধ্যাত্মিকতার অতি উন্নত উত্তরাধিকারী হলেও, সাংস্কৃতিক দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হলেও ভারতবর্ষ দারিদ্র্য, অস্পৃশ্যতার মতো সামাজিক ব্যাধিকে দূর করতে পারেনি। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য দরকার শক্তিশালী এক আধ্যাত্মিক পুরুষের নেতৃত্বে এক আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন। ১৮৯৩-তে তিনি শিকাগো ধর্ম সম্মেলনে যোগ দিয়ে সনাতন হিন্দু ধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থনে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখে সারা বিশ্বের যুক্তিবাদী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। এই সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে তিনি বিশ্বের নানা দেশে আমন্ত্রিত হয়ে অদ্বৈত বেদান্তের দার্শনিক তত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ী ভাবধারা প্রচার করেছেন। ধর্মের জীবন যে কর্মবিমুখ হতে পারে না, সারা জীবন স্বামী বিবেকানন্দ তরুণদের এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার অনতিদূরে হাওড়া জেলার বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং তাঁর নেতৃত্বে সামাজিক সংস্কার ও সেবার এক বিপুল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বেলুড়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। অজস্র চিঠিপত্র, বক্তৃতা এবং গ্রন্থে ছড়ানো তাঁর দার্শনিক ভাবনা ভাবীকালের জন্য এক অনন্য সম্পদ।

পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতি রেখে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনের তিনটি মুখ্য বিষয় এখানে আলোচিত হচ্ছে— (i) **ব্যাবহারিক বেদান্ত,** (ii) **বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ** এবং (iii) **যোগচতুষ্টয়।**

৩.১. ব্যাবহারিক বেদান্ত
Practical Vedanta

১৮৯৪ সালের ১৪ নভেম্বর লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণে[১] স্বামীজি 'বেদান্ত দর্শনের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ' সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেন। স্বামীজি তাঁর ভাষণে সবিস্তারে এ কথাই বলেন যে, **বেদান্ত দর্শন নিছক তত্ত্বগত**

১. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক অনুবাদ ও সম্পাদনা। প্রথম খণ্ড। পৃ- ৫৫২।

'বুদ্ধির কসরত' নয়, তার ব্যাবহারিক দিকও আছে। বাস্তবিকপক্ষে, স্বামীজি তাঁর ভাষণে এটাই প্রতিপাদন করেন যে, 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' বলে কিছু থাকতে পারে না—তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রয়োগ বা ব্যবহারকে যেমন তত্ত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানকেও ব্যবহার বা প্রয়োগ থেকে ভিন্ন করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে কোনো কিছুর যথাযথভাবে প্রয়োগ হতে পারে না, আবার তত্ত্বজ্ঞান সার্থক হয় ওই প্রয়োগের মাধ্যমে। যে তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রয়োগ হয় না তা অসার ও অর্থহীন। **প্রাত্যহিক জীবনের আচার-ব্যবহারের অর্থাৎ কর্মের মূলমন্ত্র প্রচার ও নির্দেশ করাই হল বেদান্তের লক্ষ্য, কর্মহীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য নয়।** নিষ্ক্রিয়তা যদি বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে 'আমাদের চারদিকের দেয়ালগুলি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান, কেননা তারা নিষ্ক্রিয়;' বলতে হবে, 'মাটির ঢেলা, কেটে ফেলা গাছের গোড়া, জগতের সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্যদ্রষ্টা, কেননা তারা নিষ্ক্রিয়।'[১]

বাস্তবিকপক্ষে, বেদান্তদর্শন আমাদের বাস্তব জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। **কর্মদর্শনই বেদান্ত প্রচার করে।** বেদান্তদর্শন আত্ম-উপলব্ধির জন্য আমাদের কর্মে উৎসাহিত করে; মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে জীবের কল্যাণসাধনে এবং জড়জগতের সংরক্ষণে প্রণোদিত করে, আর্ত, নিপীড়িত, সমাজ পরিত্যক্ত পাপীকে ভ্রাতৃজ্ঞানে আলিঙ্গন করতে বলে এবং সর্বোপরি নিজ মধ্যে এবং সর্বভূতে পরম সৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে। এক কথায় **'একম্ এব-অদ্বিতীয়ম্'— এমন উপলব্ধি ঘটিয়ে বেদান্তদর্শন মানবজীবনের আমূল রূপান্তর ঘটায়।**

তত্ত্বদর্শন এবং কর্মদর্শন, যা একটি অন্যটির পরিপূরক, বেদান্তদর্শনে প্রাচীনকাল থেকেই সহাবস্থান করেছে। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদান্তের তত্ত্বদর্শন শুধু পর্বতগুহাবাসী বা অরণ্যবাসী ঋষিদের ধ্যানের ফল নয়, তার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক উক্তিগুলি দৈনন্দিন জীবনে কর্মবীর 'জনকের মতো' রাজাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, যাদের অপেক্ষা বেশি কর্মব্যস্ত মানুষের কথা আমরা ভাবতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামীজি বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গীতার নিবিড় কর্মযোগের উল্লেখ করেছেন, যে যোগ-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছেন ভয়ংকর রণক্ষেত্রের পশ্চাদপটে। যুদ্ধের কোলাহল ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অর্জুন উচ্চতর দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করতে এবং তা জীবনে কার্যকরী করতে সময়ও পেয়েছেন। 'সে তুলনায় আমাদের জীবন যখন ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ ও আরামপূর্ণ তখন এ জীবনে অনেক কাজ করতে পারা উচিত। ...যে পরিমাণ অবকাশ আমাদের আছে তা দিয়ে আমরা জীবনে দু'শোটা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারি, তবে সে আদর্শের মানকে হীন বাস্তবের স্তরে নামিয়ে আনলে চলবে না'।[২]

একত্বই বেদান্তের কেন্দ্রীভূত আদর্শ— এক বই দুই নেই—পরম সৎ ব্রহ্ম বা আত্মা হল এক ও অদ্বয়। একমেবাদ্বিতীয়ম। তাহলে জীবন ও জগৎ মাত্র একটাই। মর্ত্যভূমি ও স্বর্গ বলে কিছু নেই এবং স্বর্গ বলে কিছু না থাকলে নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না, কেননা সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে বিশেষ কোনো স্থানে, স্বর্গে অথবা নরকে, স্থাপন করা যায় না। সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই পৃথিবী যেমন ঈশ্বরের প্রতীক, আকাশ, যে স্থানে আমরা আছি সেসব স্থানও ঈশ্বর। সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সব স্থানই ঈশ্বর, সব স্থানই ঈশ্বরের মন্দির এবং দেবস্থানরূপে পবিত্র। 'স্বর্গ অথবা নরক' বলে যদি কিছু থাকেও তাহলে সেসবও হবে ঈশ্বরের স্থানরূপে পবিত্র মন্দির। এই ব্রহ্ম বা আত্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে। **সৎ নয়, অসৎ নয়; স্বর্গ নয়, নরক নয়; জীবন নয়, মৃত্যু নয়; পাপ নয়, পুণ্য নয়— একমাত্র এক অনন্ত ব্রহ্ম বা আত্মাই সর্বত্র বিরাজিত, এমন উপলব্ধিতে প্রত্যেক মানুষকে বিশ্বজনীন কর্মে—সর্বকল্যাণ সাধক কর্মে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে। এটাই হল অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের জীবনে প্রয়োগ।**

সবই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে কোনো মানুষই ঘৃণ্য হতে পারে না, অন্ত্যজরূপে অচ্ছুত হতে পারে না, পাপীরূপে পরিত্যাজ্য হতে পারে না। সকলের মধ্যেই এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ—সকলের অন্তর্নিহিত সত্তা হল দেবসত্তা ব্রহ্ম, সকলেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে—ব্রহ্মোপলব্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। স্বামীজি বলেন, "দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা মাত্রাগত। স্বর্গ ও নরকের মধ্যে যে পার্থক্য তাও মাত্রাগত। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে

১. লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণ।

'বুদ্ধির কসরত' নয়, তার ব্যাবহারিক দিকও আছে। বাস্তবিকপক্ষে, স্বামীজি তাঁর ভাষণে এটাই প্রতিপাদন করেন যে, 'বিশুদ্ধ তত্ত্ব' বলে কিছু থাকতে পারে না—তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। প্রয়োগ বা ব্যবহারকে যেমন তত্ত্ব থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানকেও ব্যবহার বা প্রয়োগ থেকে ভিন্ন করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে কোনো কিছুর যথাযথভাবে প্রয়োগ হতে পারে না, আবার তত্ত্বজ্ঞান সার্থক হয় ওই প্রয়োগের মাধ্যমে। যে তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রয়োগ হয় না তা অসার ও অর্থহীন। **প্রাত্যহিক জীবনের আচার-ব্যবহারের অর্থাৎ কর্মের মূলমন্ত্র প্রচার ও নির্দেশ করাই হল বেদান্তের লক্ষ্য, কর্মহীনতা বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য নয়।** নিষ্ক্রিয়তা যদি বেদান্ত দর্শনের লক্ষ্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে 'আমাদের চারদিকের দেয়ালগুলি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান, কেননা তারা নিষ্ক্রিয়;' বলতে হবে, 'মাটির ঢেলা, কেটে ফেলা গাছের গোড়া, জগতের সর্বাপেক্ষা বড়ো সত্যদ্রষ্টা, কেননা তারা নিষ্ক্রিয়।'[১]

বাস্তবিকপক্ষে, বেদান্তদর্শন আমাদের বাস্তব জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। **কর্মদর্শনই বেদান্ত প্রচার করে।** বেদান্তদর্শন আত্ম-উপলব্ধির জন্য আমাদের কর্মে উৎসাহিত করে; মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে জীবের কল্যাণসাধনে এবং জড়জগতের সংরক্ষণে প্রণোদিত করে, আর্ত, নিপীড়িত, সমাজ পরিত্যক্ত পাপীকে ভ্রাতৃজ্ঞানে আলিঙ্গন করতে বলে এবং সর্বোপরি নিজ মধ্যে এবং সর্বভূতে পরম সৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত করে। এক কথায় **'একম্ এব-অদ্বিতীয়ম্'— এমন উপলব্ধি ঘটিয়ে বেদান্তদর্শন মানবজীবনের আমূল রূপান্তর ঘটায়।**

তত্ত্বদর্শন এবং কর্মদর্শন, যা একটি অন্যটির পরিপূরক, বেদান্তদর্শনে প্রাচীনকাল থেকেই সহাবস্থান করেছে। বিভিন্ন উপনিষদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, বেদান্তের তত্ত্বদর্শন শুধু পর্বতগুহাবাসী বা অরণ্যবাসী ঋষিদের ধ্যানের ফল নয়, তার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক উক্তিগুলি দৈনন্দিন জীবনে কর্মবীর 'জনকের মতো' রাজাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, যাদের অপেক্ষা বেশি কর্মব্যস্ত মানুষের কথা আমরা ভাবতে পারি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ স্বামীজি বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গীতার নিবিড় কর্মযোগের উল্লেখ করেছেন, যে যোগ-শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়েছেন ভয়ংকর রণক্ষেত্রের পশ্চাদপটে। যুদ্ধের কোলাহল ও কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অর্জুন উচ্চতর দর্শনতত্ত্ব আলোচনা করতে এবং তা জীবনে কার্যকরী করতে সময়ও পেয়েছেন। 'সে তুলনায় আমাদের জীবন যখন ভারমুক্ত, স্বচ্ছন্দ ও আরামপূর্ণ তখন এ জীবনে অনেক কাজ করতে পারা উচিত। ...যে পরিমাণ অবকাশ আমাদের আছে তা দিয়ে আমরা জীবনে দু'শোটা আদর্শকে রূপায়িত করতে পারি, তবে সে আদর্শের মানকে হীন বাস্তবের স্তরে নামিয়ে আনলে চলবে না'।[২]

একত্বই বেদান্তের কেন্দ্রীভূত আদর্শ— এক বই দুই নেই—পরম সৎ ব্রহ্ম বা আত্মা হল এক ও অদ্বয়। একমেবাদ্বিতীয়ম। তাহলে জীবন ও জগৎ মাত্র একটাই। মর্ত্যভূমি ও স্বর্গ বলে কিছু নেই এবং স্বর্গ বলে কিছু না থাকলে নরক বলেও কিছু থাকতে পারে না, কেননা সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে বিশেষ কোনো স্থানে, স্বর্গে অথবা নরকে, স্থাপন করা যায় না। সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। এই পৃথিবী যেমন ঈশ্বরের প্রতীক, আকাশ, যে স্থানে আমরা আছি সেসব স্থানও ঈশ্বর। সব কিছুই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সব স্থানই ঈশ্বর, সব স্থানই ঈশ্বরের মন্দির এবং দেবস্থানরূপে পবিত্র। 'স্বর্গ অথবা নরক' বলে যদি কিছু থাকেও তাহলে সেসবও হবে ঈশ্বরের স্থানরূপে পবিত্র মন্দির। এই ব্রহ্ম বা আত্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে। **সৎ নয়, অসৎ নয়; স্বর্গ নয়, নরক নয়; জীবন নয়, মৃত্যু নয়; পাপ নয়, পুণ্য নয়— একমাত্র এক অনন্ত ব্রহ্ম বা আত্মাই সর্বত্র বিরাজিত, এমন উপলব্ধিতে প্রত্যেক মানুষকে বিশ্বজনীন কর্মে—সর্বকল্যাণ সাধক কর্মে সর্বদা নিয়োজিত থাকতে হবে। এটাই হল অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের তত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের জীবনে প্রয়োগ।**

সবই যদি ব্রহ্ম হয় তাহলে কোনো মানুষই ঘৃণ্য হতে পারে না, অন্ত্যজরূপে অচ্ছুত হতে পারে না, পাপীরূপে পরিত্যাজ্য হতে পারে না। সকলের মধ্যেই এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ—সকলের অন্তর্নিহিত সত্তা হল দেবসত্তা ব্রহ্ম, সকলেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে—ব্রহ্মোপলব্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। স্বামীজি বলেন, "দুর্বলতা ও শক্তির মধ্যে পার্থক্যটা মাত্রাগত। স্বর্গ ও নরকের মধ্যে যে পার্থক্য তাও মাত্রাগত। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে

১. লন্ডনে প্রদত্ত ভাষণ।

পার্থক্য তাও মাত্রাগত। জগতের সব পার্থক্যই মাত্রাগত, বস্তুগত নয়। কারণ একত্বই হচ্ছে সবকিছুর মূল মন্ত্র'।[১] 'পাপ'-এর ধারণার উল্লেখ করে স্বামীজি এই 'মাত্রাগত পার্থক্যের বিষয়টি' বুঝিয়েছেন। কিছু মানুষকে সমাজ পাপীরূপে গণ্য করে। যে মিথ্যা কথা বলে, অসৎ চিন্তা পোষণ করে সে পাপী। এখানে মানুষকে অনন্ত শক্তিসম্পন্নরূপে গণ্য করার পরিবর্তে তাকে দুর্বলচিত্তরূপে গণ্য করা হয়। কিছু মানুষকে এভাবে পাপী বলার পরিবর্তে বেদান্ত এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলে 'তুমি শুদ্ধ, তুমি পূর্ণ, পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না, যা চিরভাস্বর তা মালিন্যযুক্ত হতে পারে না। পাপ হচ্ছে, অজ্ঞান-আবৃত আত্মার নিম্ন মাত্রায় প্রকাশ, যেমন মেঘাবৃত হলে সূর্যের প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় হয় না। তুমি স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্ম, তোমার আত্মাকে তুমি উচ্চমাত্রায়—পূর্ণমাত্রায়—প্রকাশ করো। বেদান্ত বলে, 'কোনো মানুষেরই কখনও 'না', 'আমি পারি না' এমন বলা উচিত নয়। মানুষ মাত্রই নিজ চেষ্টায় সব কিছুই করতে পারে, মানুষের সাধ্যাতীত কিছুই থাকতে পারে না, কেননা সে অনন্ত, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম—অয়মাত্মাব্রহ্ম। এখানেই বেদান্তদর্শনের বিশ্বজনীনতা। বেদান্তদর্শন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-জ্ঞান-সম্পদ-বংশপরিচয় নির্বিশেষে বিশ্বের সব দেশের সব মানুষকে ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বজনীন কল্যাণসাধক কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। **বেদান্তদর্শন বা বেদান্তসম্মত মানবধর্ম কেবল তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, তত্ত্বকে বা ধর্মকে কার্যকরী করারও নির্দেশ সেখানে আছে। ধর্ম যদি মানুষের কোনো উপকার করতে না পারে, তাহলে মানবজীবনে সেই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। বেদান্তসম্মত ধর্ম সার্থক হয়েছে তার প্রায়োগিক দিকের জন্য— বৈদান্তিক ধর্মকে কার্যকরী করার নির্দেশই হল এই তত্ত্বদর্শনের প্রায়োগিক দিক।**

স্বামীজি বলেন, **'আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য আত্মবিশ্বাসের আদর্শই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক',**[২] এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবই সমুদয় অশুভ শক্তি ও দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। সাধারণ মতে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। কিন্তু বেদান্তসম্মত মত অনুসরণ করে স্বামীজি বলেন, "যার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই (অর্থাৎ যে বিশ্বাস করে না যে, স্বরূপত সে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর), সে একজন নাস্তিক।"[৩] তবে, যেহেতু বেদান্ত মতে, আত্ম-পর ভেদ নেই, সবই এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের অধিকাধিক প্রকাশ, এই আত্মবিশ্বাস আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব বিশ্বাস নয়; এই বিশ্বাসের নিহিতার্থ হল সকলের ওপর সমানভাবে বিশ্বাস। **নিজেকে বিশ্বাস করার অর্থ হল, সকলকে বিশ্বাস করা,** কেননা সকলকে বিশ্বাস করলে তবেই নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আমরা সকলেই এক—ভেদশূন্য এক। তেমনি নিজেকে ভালোবাসার অর্থ হল, সকলকে ভালোবাসা, সকল প্রাণী—জীব-অজীব সকলকে ভালোবাসা, কারণ সকলেই এক। এমন আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে কর্মে ব্রতী হলে সেই কর্ম স্বার্থমগ্ন কর্ম হয় না, তা হয় বিশ্বজনের হিতার্থে কর্ম। বেদান্তদর্শন মানুষের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে তাকে কর্মে উৎসাহিত করে। **বেদান্তদর্শন বা বেদান্তসম্মত ধর্ম নিছক তত্ত্বকথা নয়।**

বৈদান্তিকতত্ত্ব অনুসারে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই— কেউ ক্ষুদ্র নয়, হীন নয়, উপেক্ষণীয় নয়, অন্ত্যজ নয়; মানুষ মাত্রই একই পরম ব্রহ্মের অধিকাধিক অভিব্যক্তি। বৈদান্তিক এই তত্ত্বের ওপর মানুষের বিশ্বাস মানুষকে মহান করে, পবিত্র করে, ঐশ্বর্যবান করে, মানুষের অন্তরকে দৈবপ্রভায় আলোকিত করে। নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে জয় করে মানুষ বিশ্বজনের হিতসাধক কর্মে আত্মনিয়োগ করে। বৈদান্তিক তত্ত্ব এভাবে তার প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে।

বেদান্তদর্শন আরও বলে যে, নিজ মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কর্মসাধন করতে হবে। অসাধ্য কর্ম বলে মানুষের জীবনে কিছুই থাকতে পারে না, কেননা তার অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্রহ্মশক্তি সীমিত নয়, তা অসীম ও অনন্ত। ভ্রান্ত ধারণাবশত আমরা হীনম্মন্যতার শিকার হই এবং বিপদাপন্ন হলে, আত্মশক্তিতে বিপদমুক্তি সম্ভব নয় মনে করে, বাইরের কোনো শক্তির কাছ থেকে, যথা ঈশ্বরের কাছ থেকে, সাহায্য প্রার্থনা

১. পূর্ববৎ।
২. ঐ
৩. ঐ

পার্থক্য তাও মাত্রাগত। জগতের সব পার্থক্যই মাত্রাগত, বস্তুগত নয়। কারণ একত্বই হচ্ছে সবকিছুর মূল মন্ত্র'।[১] 'পাপ'-এর ধারণার উল্লেখ করে স্বামীজি এই 'মাত্রাগত পার্থক্যের বিষয়টি' বুঝিয়েছেন। কিছু মানুষকে সমাজ পাপীরূপে গণ্য করে। যে মিথ্যা কথা বলে, অসৎ চিন্তা পোষণ করে সে পাপী। এখানে মানুষকে অনন্ত শক্তিসম্পন্নরূপে গণ্য করার পরিবর্তে তাকে দুর্বলচিত্তরূপে গণ্য করা হয়। কিছু মানুষকে এভাবে পাপী বলার পরিবর্তে বেদান্ত এক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বলে 'তুমি শুদ্ধ, তুমি পূর্ণ, পাপ তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না, যা চিরভাস্বর তা মালিন্যযুক্ত হতে পারে না। পাপ হচ্ছে, অজ্ঞান-আবৃত আত্মার নিম্ন মাত্রায় প্রকাশ, যেমন মেঘাবৃত হলে সূর্যের প্রকাশ পূর্ণমাত্রায় হয় না। তুমি স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্ম, তোমার আত্মাকে তুমি উচ্চমাত্রায়—পূর্ণমাত্রায়—প্রকাশ করো। বেদান্ত বলে, 'কোনো মানুষেরই কখনও 'না', 'আমি পারি না' এমন বলা উচিত নয়। মানুষ মাত্রই নিজ চেষ্টায় সব কিছুই করতে পারে, মানুষের সাধ্যাতীত কিছুই থাকতে পারে না, কেননা সে অনন্ত, সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম—অয়মাত্মাব্রহ্ম। এখানেই বেদান্তদর্শনের বিশ্বজনীনতা। বেদান্তদর্শন জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-জ্ঞান-সম্পদ-বংশপরিচয় নির্বিশেষে বিশ্বের সব দেশের সব মানুষকে ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম-উপলব্ধির উদ্দেশ্যে বিশ্বজনীন কল্যাণসাধক কর্মে উদ্‌বুদ্ধ করে। **বেদান্তদর্শন বা বেদান্তসম্মত মানবধর্ম কেবল তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, তত্ত্বকে বা ধর্মকে কার্যকরী করারও নির্দেশ সেখানে আছে। ধর্ম যদি মানুষের কোনো উপকার করতে না পারে, তাহলে মানবজীবনে সেই ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই। বেদান্তসম্মত ধর্ম সার্থক হয়েছে তার প্রায়োগিক দিকের জন্য— বৈদান্তিক ধর্মকে কার্যকরী করার নির্দেশই হল এই তত্ত্বদর্শনের প্রায়োগিক দিক।**

স্বামীজি বলেন, **'আত্মোপলব্ধি বা ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য আত্মবিশ্বাসের আদর্শই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সহায়ক',**[২] এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবই সমুদয় অশুভ শক্তি ও দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ। সাধারণ মতে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে নাস্তিক। কিন্তু বেদান্তসম্মত মত অনুসরণ করে স্বামীজি বলেন, "যার নিজের ওপর বিশ্বাস নেই (অর্থাৎ যে বিশ্বাস করে না যে, স্বরূপত সে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর), সে একজন নাস্তিক।"[৩] তবে, যেহেতু বেদান্ত মতে, আত্ম-পর ভেদ নেই, সবই এক ও অদ্বয় ব্রহ্মের অধিকাধিক প্রকাশ, এই আত্মবিশ্বাস আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থসর্বস্ব বিশ্বাস নয়; এই বিশ্বাসের নিহিতার্থ হল সকলের ওপর সমানভাবে বিশ্বাস। **নিজেকে বিশ্বাস করার অর্থ হল, সকলকে বিশ্বাস করা,** কেননা সকলকে বিশ্বাস করলে তবেই নিজের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। আমরা সকলেই এক—ভেদশূন্য এক। তেমনি নিজেকে ভালোবাসার অর্থ হল, সকলকে ভালোবাসা, সকল প্রাণী—জীব-অজীব সকলকে ভালোবাসা, কারণ সকলেই এক। এমন আত্মবিশ্বাসকে জাগ্রত করে কর্মে ব্রতী হলে সেই কর্ম স্বার্থমগ্ন কর্ম হয় না, তা হয় বিশ্বজনের হিতার্থে কর্ম। বেদান্তদর্শন মানুষের মধ্যে এমন আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে তাকে কর্মে উৎসাহিত করে। **বেদান্তদর্শন বা বেদান্তসম্মত ধর্ম নিছক তত্ত্বকথা নয়।**

বৈদান্তিকতত্ত্ব অনুসারে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ নেই— কেউ ক্ষুদ্র নয়, হীন নয়, উপেক্ষণীয় নয়, অন্ত্যজ নয়; মানুষ মাত্রই একই পরম ব্রহ্মের অধিকাধিক অভিব্যক্তি। বৈদান্তিক এই তত্ত্বের ওপর মানুষের বিশ্বাস মানুষকে মহান করে, পবিত্র করে, ঐশ্বর্যবান করে, মানুষের অন্তরকে দৈবপ্রভায় আলোকিত করে। নিজের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতাকে জয় করে মানুষ বিশ্বজনের হিতসাধক কর্মে আত্মনিয়োগ করে। বৈদান্তিক তত্ত্ব এভাবে তার প্রয়োগের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে।

বেদান্তদর্শন আরও বলে যে, নিজ মধ্যে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে ব্রহ্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে কর্মসাধন করতে হবে। অসাধ্য কর্ম বলে মানুষের জীবনে কিছুই থাকতে পারে না, কেননা তার অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্রহ্মশক্তি সীমিত নয়, তা অসীম ও অনন্ত। ভ্রান্ত ধারণাবশত আমরা হীনম্মন্যতার শিকার হই এবং বিপদাপন্ন হলে, আত্মশক্তিতে বিপদমুক্তি সম্ভব নয় মনে করে, বাইরের কোনো শক্তির কাছ থেকে, যথা ঈশ্বরের কাছ থেকে, সাহায্য প্রার্থনা

১. পূর্ববৎ।
২. ঐ
৩. ঐ

করি। এসবই অন্ধ সংস্কার, কুসংস্কার যা আমরা এযাবৎ আমাদের সমাজের কাছ থেকে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে লাভ করেছি। এখানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসম্মত নীতিবিদ বুদ্ধদেবের বাণী স্মরণীয়—'আত্মদীপোভবঃ'—তোমার (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের) মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে অনন্ত সূর্যশক্তি—তুমি আপন চেষ্টায় আপন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হও— তোমার আত্মবিকাশের জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের এমনকি ঈশ্বরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন'। স্বামীজিও একইভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষকে বাইরের কোনো সাহায্য পাবার আশায় প্রার্থনাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন, কেননা তা অর্থহীন; এক বৈ দুই না থাকলে 'বাইরে' বলে কিছু থাকতে পারে না। স্বামীজি লন্ডনবাসী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা আমাকে এমন একটি ঘটনারও কথা বলুন যেখানে বাইরে থেকে এইসব প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেছে? এইসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাড়া পাওয়া গেছে, তা এসেছে আপনাদের অন্তর থেকে।"[১] এসবই হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে লালিত কুসংস্কার। পরিবারে এবং সমাজে বাস করে তাদের অনুসৃত ধ্যানধারণা অনুসারে আমরা এইসব অন্ধ সংস্কারগুলিকে লালন করি এবং তাদের দাসত্ব স্বীকার করি। এইসব কুসংস্কারকে জয় করে তাদের প্রভু হতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে, অপরের সাহায্যের প্রতি আস্থা না রেখে কেবল আত্মনির্ভররূপে কর্ম করতে হবে। **বিশ্বজগতের একত্ব এবং আত্মবিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের কাছ থেকে আর কিছুই শিক্ষণীয় থাকতে পারে না।** বহু জগৎ, বহু জীবন, এসবের কোনোটিও সত্য নয়। সব বহুত্বই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর বিচিত্র প্রকাশ। এজন্য **আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, নিজেকে দুর্বলরূপে, অক্ষমরূপে গণ্য না করে, আমাদের প্রত্যেককে কর্মে ব্রতী হতে হবে। এভাবে বীর্যবান হয়ে বীরের মতো কর্ম সাধন করলে, স্বামীজি বলেন, আজ যে কাজ মানুষ ১০০ দিনে সম্পন্ন করে তা এক নিমেষে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং জগৎ এক নিরন্তর কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে পরিণত হবে।** স্বামীজি তাঁর ভাষণে লন্ডনবাসীকে তথা জগতের প্রতিটি মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, "হে মহাশক্তিমান, জাগুন, উঠে দাঁড়ান, আলস্য বা নিদ্রা আপনার শোভা পায় না। এ কথা ক্ষণকালের জন্য ভাববেন না যে আপনারা দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত, পাপী। হে মহাশক্তিমান, জাগুন, উঠুন, আপনার নিজ স্বরূপকে কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করুন। দেখবেন কেমন করে বিদ্যুৎ চমকের মতো সবকিছু চকিতে উদ্ভাসিত, প্রকাশিত ও রূপায়িত হচ্ছে।"[২]

বেদান্তদর্শনে বুদ্ধিগত ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক হলেও **হৃদয়ের দিকটাই অধিকতর মূল্যবান**—হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রত্যক্ষীভূত হন, বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন, "বুদ্ধি যেন ঝাড়ুদার, যে আমাদের চলার পথকে পরিষ্কার করে; অথবা বুদ্ধি যেন রক্ষী বা চৌকিদার, যার কাজ হল বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করা।" **সত্য উপলব্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে অনুভূতির কাজই মুখ্য**—অনুভূতিই ঈশ্বর দর্শন করাতে সমর্থ, বুদ্ধি নয়। **অনুভূতিসঞ্জাত প্রেম-ভালোবাসাই মানুষের সঙ্গে মানুষের, জীবজগতের, বন্ধন রচনা করে, একত্ব বা ঐক্য সৃষ্টি করে।** বুদ্ধি বিভেদকামী, প্রেম মিলনাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধি এক থেকে অন্যকে বিযুক্ত করে, প্রেম অনেককে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। **প্রেমই হল পরম অস্তিত্ব, স্বয়ং-সৎ ঈশ্বর।** প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম। ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদের—বুদ্ধদেবের, জিশুখ্রিস্টের শক্তি কি তাদের বুদ্ধিতে নিহিত ছিল? তাঁদের একজনও কি দর্শনশাস্ত্রের ওপর অথবা তর্কবিদ্যার মতো কোনো বই লিখেছেন? তাঁরা কেবল হৃদয় দিয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনা অনুভব করেছেন। স্বামীজি তাই বলেন, "বুদ্ধের মতো অনুভব করুন আপনারাও বুদ্ধ হবেন, খ্রিস্টের মতো অনুভব করুন আপনারাও খ্রিস্ট হবেন। অনুভূতিই প্রাণ, অনুভূতিই শক্তি। বুদ্ধি হল গতিশক্তিহীন। অনুভূতি যখন বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে গতি দান করে, কেবল তখনই তা গতিলাভ করে, অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। **বৈদান্তিক নীতিবোধের এটাই হল সর্বাপেক্ষা বাস্তবসম্মত দিক।** বেদান্তদর্শন মানুষকে এমন শিক্ষাই দেয় যে তারা স্বরূপত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং এই অন্তরবাসী ঈশ্বরকে প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা উপলব্ধি করে সর্বজন-হিতায় কর্মসাধন করতে হবে।"[৩]

১. পূর্ববৎ।
২. ঐ
৩. ঐ

করি। এসবই অন্ধ সংস্কার, কুসংস্কার যা আমরা এযাবৎ আমাদের সমাজের কাছ থেকে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে লাভ করেছি। এখানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মসম্মত নীতিবিদ বুদ্ধদেবের বাণী স্মরণীয়—'আত্মদীপোভবঃ'—তোমার (অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের) মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে অনন্ত সূর্যশক্তি—তুমি আপন চেষ্টায় আপন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হও— তোমার আত্মবিকাশের জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের এমনকি ঈশ্বরের সাহায্য নিষ্প্রয়োজন'। স্বামীজিও একইভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষকে বাইরের কোনো সাহায্য পাবার আশায় প্রার্থনাকে নিষ্প্রয়োজনীয় বলেছেন, কেননা তা অর্থহীন; এক বৈ দুই না থাকলে 'বাইরে' বলে কিছু থাকতে পারে না। স্বামীজি লন্ডনবাসী শ্রোতাদের জিজ্ঞাসা করেন, "আপনারা আমাকে এমন একটি ঘটনারও কথা বলুন যেখানে বাইরে থেকে এইসব প্রার্থনায় সাড়া পাওয়া গেছে? এইসবের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে সাড়া পাওয়া গেছে, তা এসেছে আপনাদের অন্তর থেকে।"[১] এসবই হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে লালিত কুসংস্কার। পরিবারে এবং সমাজে বাস করে তাদের অনুসৃত ধ্যানধারণা অনুসারে আমরা এইসব অন্ধ সংস্কারগুলিকে লালন করি এবং তাদের দাসত্ব স্বীকার করি। এইসব কুসংস্কারকে জয় করে তাদের প্রভু হতে হবে। আত্মবিশ্বাসী হয়ে, অপরের সাহায্যের প্রতি আস্থা না রেখে কেবল আত্মনির্ভররূপে কর্ম করতে হবে। **বিশ্বজগতের একত্ব এবং আত্মবিশ্বাস ব্যতীত ধর্মের কাছ থেকে আর কিছুই শিক্ষণীয় থাকতে পারে না।** বহু জগৎ, বহু জীবন, এসবের কোনোটিও সত্য নয়। সব বহুত্বই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর বিচিত্র প্রকাশ। এজন্য **আত্মবলে বলীয়ান হয়ে, নিজেকে দুর্বলরূপে, অক্ষমরূপে গণ্য না করে, আমাদের প্রত্যেককে কর্মে ব্রতী হতে হবে। এভাবে বীর্যবান হয়ে বীরের মতো কর্ম সাধন করলে, স্বামীজি বলেন, আজ যে কাজ মানুষ ১০০ দিনে সম্পন্ন করে তা এক নিমেষে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং জগৎ এক নিরন্তর কর্মযজ্ঞের ক্ষেত্রে পরিণত হবে।** স্বামীজি তাঁর ভাষণে লন্ডনবাসীকে তথা জগতের প্রতিটি মানুষকে সম্বোধন করে বলেন, "হে মহাশক্তিমান, জাগুন, উঠে দাঁড়ান, আলস্য বা নিদ্রা আপনার শোভা পায় না। এ কথা ক্ষণকালের জন্য ভাববেন না যে আপনারা দুর্বল, দুর্দশাগ্রস্ত, পাপী। হে মহাশক্তিমান, জাগুন, উঠুন, আপনার নিজ স্বরূপকে কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করুন। দেখবেন কেমন করে বিদ্যুৎ চমকের মতো সবকিছু চকিতে উদ্ভাসিত, প্রকাশিত ও রূপায়িত হচ্ছে।"[২]

বেদান্তদর্শনে বুদ্ধিগত ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যিক হলেও **হৃদয়ের দিকটাই অধিকতর মূল্যবান**—হৃদয়ের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রত্যক্ষীভূত হন, বুদ্ধির মাধ্যমে নয়। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন, "বুদ্ধি যেন ঝাড়ুদার, যে আমাদের চলার পথকে পরিষ্কার করে; অথবা বুদ্ধি যেন রক্ষী বা চৌকিদার, যার কাজ হল বিশৃঙ্খলা প্রশমিত করা।" **সত্য উপলব্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে অনুভূতির কাজই মুখ্য**—অনুভূতিই ঈশ্বর দর্শন করাতে সমর্থ, বুদ্ধি নয়। **অনুভূতিসঞ্জাত প্রেম-ভালোবাসাই মানুষের সঙ্গে মানুষের, জীবজগতের, বন্ধন রচনা করে, একত্ব বা ঐক্য সৃষ্টি করে।** বুদ্ধি বিভেদকামী, প্রেম মিলনাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধি এক থেকে অন্যকে বিযুক্ত করে, প্রেম অনেককে এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে। **প্রেমই হল পরম অস্তিত্ব, স্বয়ং-সৎ ঈশ্বর।** প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই প্রেম। ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষদের—বুদ্ধদেবের, জিশুখ্রিস্টের শক্তি কি তাদের বুদ্ধিতে নিহিত ছিল? তাঁদের একজনও কি দর্শনশাস্ত্রের ওপর অথবা তর্কবিদ্যার মতো কোনো বই লিখেছেন? তাঁরা কেবল হৃদয় দিয়ে মানুষের দুঃখকষ্ট, ব্যথা-বেদনা অনুভব করেছেন। স্বামীজি তাই বলেন, "বুদ্ধের মতো অনুভব করুন আপনারাও বুদ্ধ হবেন, খ্রিস্টের মতো অনুভব করুন আপনারাও খ্রিস্ট হবেন। অনুভূতিই প্রাণ, অনুভূতিই শক্তি। বুদ্ধি হল গতিশক্তিহীন। অনুভূতি যখন বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে তাকে গতি দান করে, কেবল তখনই তা গতিলাভ করে, অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। **বৈদান্তিক নীতিবোধের এটাই হল সর্বাপেক্ষা বাস্তবসম্মত দিক।** বেদান্তদর্শন মানুষকে এমন শিক্ষাই দেয় যে তারা স্বরূপত ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং এই অন্তরবাসী ঈশ্বরকে প্রেম ও ভালোবাসার দ্বারা উপলব্ধি করে সর্বজন-হিতায় কর্মসাধন করতে হবে।"[৩]

১. পূর্ববৎ।
২. ঐ
৩. ঐ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ বুদ্ধি-বিচার নির্ভর হতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ অবশ্যই অনুভব-নির্ভর হবে। বেদান্তদর্শনে এমন অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে। মানুষমাত্রই কখনও না কখনও নিজ মধ্যে ঐশ্বরিক অত্যাশ্চর্য মহিমা অনুভব করে, প্রত্যক্ষ করে—অত্যন্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ অতর্কিতে অপরের জীবনরক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে। এটাই অনুভব-ঘটিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ। জগতে বুদ্ধদেব ও খ্রিস্ট যে এসেছিলেন তার প্রমাণ কী? এর প্রমাণ হল আমাদের অনুভব—আমরা সবাই তাঁদের মতো অনুভব করি। এই আত্ম-অনুভবের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে একদা তাঁরা সত্য সত্যই ছিলেন অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত মহাপুরুষসুলভ অনুভবই ওইসব মহাপুরুষের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ—আমাদের দেবসত্তাই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমাণ। **এটাই হল বাস্তবসম্মত বৈদান্তিক আদর্শ।** প্রতিটি মানুষকে মহাপুরুষ হতে হবে, ঈশ্বর হতে হবে। মানুষমাত্রই স্বরূপত মহাপুরুষ ঈশ্বর—মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই ঈশ্বর হয়ে আছে, তাকে কেবল সেবাব্রতের মাধ্যমে সেই পরম সত্যকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। এমন উপলব্ধি হলে মানুষের জগতে হিংসা, দ্বেষ অপসৃত হবে এবং মানুষ প্রেম-ভালোবাসার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবজগতের কল্যাণসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। **যে দর্শন মানুষকে এমন অমৃতবাণী শোনায় তাকে নিছক তত্ত্বগত বলা চলে না, তার ব্যাবহারিক দিকেরও উল্লেখ করতে হয়।**

বেদান্ত মতে, **মানুষের দেহে মানুষের আত্মাই হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর যা আমাদের একমাত্র উপাসনাযোগ্য।** খ্রিস্টানরা বলে 'গড্'ই (God) একমাত্র ঈশ্বর; মুসলমানরা বলে, আল্লা ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। **বেদান্ত বলে এমন কিছু নেই যা ঈশ্বর নয়**—জগতের সবই এক ও অদ্বয় ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। জীবই ঈশ্বর এবং জীবদেহ ঈশ্বরের মন্দির আর মানুষের দেহ সর্বোত্তম মন্দির,—স্বামীজির কথায় 'সৌধদের মধ্যে তাজমহল'। এমন মন্দিরে দেবতার উপাসনা করার পরিবর্তে গির্জায় বা মসজিদে বা মানুষের তৈরি দেবালয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা বাতুলতা মাত্র। **মানুষের দেহমন্দিরে ঈশ্বরের সেবা অর্থাৎ মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এমন সেবাই মানুষের সমাজকে উন্নত করে, মানুষের জীবনকে আনন্দিত করে। এমন বাস্তবসম্মত ধর্ম নজিরবিহীন।**

৩.২. বিশ্বজনীন ধর্ম
Universal Religion

মানুষ তার স্বভাবজাত তাড়নায়, তার দৃষ্টিসীমার অতীত লোককে দেখতে চেয়েছে এবং এই অনুসন্ধানই তার ব্যক্তিজীবনকে, সমাজজীবনকে, উন্নত ও প্রসারিত করেছে। এই অনুসন্ধানই হল স্বয়ং-সৎ ঈশ্বরের অনুসন্ধান এবং এই অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম। তবে 'সত্য'-এর অনুসন্ধানে ধর্মের আবির্ভাব হলেও সেই ধর্ম সর্বদা শিব (কল্যাণকর) ও সুন্দর হয়নি। বাইরে জগতে যেমন দুটি বিরুদ্ধ শক্তি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ক্রিয়া করে, মানুষের অন্তর্জগতেও তেমনি দুটি বিরুদ্ধ শক্তি প্রেম, ও ঘৃণা, সৎ ও অসৎ আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৮৯০ সালের ২৮ নভেম্বর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত পাসাডোনাস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে স্বামীজি-প্রদত্ত ভাষণ থেকে এ-প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা গেল।[১]

"ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছুই মানুষের কাছে বেশী আশীর্বাদের কারণ হয়ে উঠতে পারেনি—ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছুই মানুষের কাছে বেশী বিভীষিকার কারণ হয়ে ওঠেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই শান্তি ও প্রেমের জন্য চেষ্টা করেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই বেশী ভয়ঙ্কর ঘৃণার সৃষ্টি করেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব বেশী করে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি—ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই মানুষে মানুষে বেশী তিক্ত শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারেনি। ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছু মানুষের জন্য, এমনকি পশুদের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলেনি—ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছু পৃথিবীকে এত রক্তস্রোতের দ্বারা প্লাবিত করেনি।

১. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র—

ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ বুদ্ধি-বিচার নির্ভর হতে পারে না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ অবশ্যই অনুভব-নির্ভর হবে। বেদান্তদর্শনে এমন অভিমতই প্রকাশ পেয়েছে। মানুষমাত্রই কখনও না কখনও নিজ মধ্যে ঐশ্বরিক অত্যাশ্চর্য মহিমা অনুভব করে, প্রত্যক্ষ করে—অত্যন্ত দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ অতর্কিতে অপরের জীবনরক্ষায় আত্মোৎসর্গ করে। এটাই অনুভব-ঘটিত ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ। জগতে বুদ্ধদেব ও খ্রিস্ট যে এসেছিলেন তার প্রমাণ কী? এর প্রমাণ হল আমাদের অনুভব—আমরা সবাই তাঁদের মতো অনুভব করি। এই আত্ম-অনুভবের মাধ্যমেই আমরা বুঝতে পারি যে একদা তাঁরা সত্য সত্যই ছিলেন অর্থাৎ আমাদের অন্তর্নিহিত মহাপুরুষসুলভ অনুভবই ওইসব মহাপুরুষের অস্তিত্ব-সাধক প্রমাণ—আমাদের দেবসত্তাই স্বয়ং ঈশ্বরের প্রমাণ। **এটাই হল বাস্তবসম্মত বৈদান্তিক আদর্শ।** প্রতিটি মানুষকে মহাপুরুষ হতে হবে, ঈশ্বর হতে হবে। মানুষমাত্রই স্বরূপত মহাপুরুষ ঈশ্বর—মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই ঈশ্বর হয়ে আছে, তাকে কেবল সেবাব্রতের মাধ্যমে সেই পরম সত্যকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। এমন উপলব্ধি হলে মানুষের জগতে হিংসা, দ্বেষ অপসৃত হবে এবং মানুষ প্রেম-ভালোবাসার নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবজগতের কল্যাণসাধনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। **যে দর্শন মানুষকে এমন অমৃতবাণী শোনায় তাকে নিছক তত্ত্বগত বলা চলে না, তার ব্যাবহারিক দিকেরও উল্লেখ করতে হয়।**

বেদান্ত মতে, **মানুষের দেহে মানুষের আত্মাই হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বর যা আমাদের একমাত্র উপাসনাযোগ্য।** খ্রিস্টানরা বলে 'গড্'ই (God) একমাত্র ঈশ্বর; মুসলমানরা বলে, আল্লা ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। **বেদান্ত বলে এমন কিছু নেই যা ঈশ্বর নয়**—জগতের সবই এক ও অদ্বয় ঈশ্বর, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়। জীবই ঈশ্বর এবং জীবদেহ ঈশ্বরের মন্দির আর মানুষের দেহ সর্বোত্তম মন্দির,—স্বামীজির কথায় 'সৌধদের মধ্যে তাজমহল'। এমন মন্দিরে দেবতার উপাসনা করার পরিবর্তে গির্জায় বা মসজিদে বা মানুষের তৈরি দেবালয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা বাতুলতা মাত্র। **মানুষের দেহমন্দিরে ঈশ্বরের সেবা অর্থাৎ মানুষের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এমন সেবাই মানুষের সমাজকে উন্নত করে, মানুষের জীবনকে আনন্দিত করে। এমন বাস্তবসম্মত ধর্ম নজিরবিহীন।**

৩.২. বিশ্বজনীন ধর্ম
Universal Religion

মানুষ তার স্বভাবজাত তাড়নায়, তার দৃষ্টিসীমার অতীত লোককে দেখতে চেয়েছে এবং এই অনুসন্ধানই তার ব্যক্তিজীবনকে, সমাজজীবনকে, উন্নত ও প্রসারিত করেছে। এই অনুসন্ধানই হল স্বয়ং-সৎ ঈশ্বরের অনুসন্ধান এবং এই অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে বিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম। তবে 'সত্য'-এর অনুসন্ধানে ধর্মের আবির্ভাব হলেও সেই ধর্ম সর্বদা শিব (কল্যাণকর) ও সুন্দর হয়নি। বাইরে জগতে যেমন দুটি বিরুদ্ধ শক্তি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, ক্রিয়া করে, মানুষের অন্তর্জগতেও তেমনি দুটি বিরুদ্ধ শক্তি প্রেম, ও ঘৃণা, সৎ ও অসৎ আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

১৮৯০ সালের ২৮ নভেম্বর আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত পাসাডোনাস্থিত ইউনিভার্সালিস্ট চার্চে স্বামীজি-প্রদত্ত ভাষণ থেকে এ-প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা গেল।[১]

"ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছুই মানুষের কাছে বেশী আশীর্বাদের কারণ হয়ে উঠতে পারেনি—ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছুই মানুষের কাছে বেশী বিভীষিকার কারণ হয়ে ওঠেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই শান্তি ও প্রেমের জন্য চেষ্টা করেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই বেশী ভয়ঙ্কর ঘৃণার সৃষ্টি করেনি। ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব বেশী করে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি—ধর্মের চেয়ে কোন কিছুই মানুষে মানুষে বেশী তিক্ত শত্রুতার সৃষ্টি করতে পারেনি। ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছু মানুষের জন্য, এমনকি পশুদের জন্য হাসপাতাল প্রভৃতি দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলেনি—ধর্মের চেয়ে আর কোন কিছু পৃথিবীকে এত রক্তস্রোতের দ্বারা প্লাবিত করেনি।

১. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র—

ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে তাই এটাই মনে হয় যে, বিশ্বধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম একটা আদর্শমাত্র, যে আদর্শকে কিছু শুদ্ধচিত্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ যুগে যুগে নানা দেশে ও নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং যে আদর্শকে অদ্যাপি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবায়িত না হওয়ার হেতু হল, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নির্বিচারবাদ, গোড়ামি। প্রত্যেক ধর্ম অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় তার নিজস্ব মতবাদ বা তত্ত্বসমূহকে প্রকাশ করে জোরের সঙ্গে দাবি করে যে, তার মতবাদ বা তত্ত্বই একমাত্র সত্য। ঐসব ধর্ম-সম্প্রদায়ের সদস্যরা আরও মনে করে যে, তাদের তত্ত্বে বিশ্বাস না করলে অবিশ্বাসীদের ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণাভোগ অনিবার্য। অনেকে আবার, বল প্রয়োগ ক'রে, তরবারি বার ক'রে অবিশ্বাসীদের তাদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।[১] স্বামীজি বলেন, এটা কোনো কুপ্রবৃত্তি থেকে হয় না। এটা হয় মস্তিষ্কের একটা বিশেষ রোগ থেকে যাকে বলা হয় ধর্মোন্মত্ততা। ...**এই ধর্মোন্মাদ রোগ সব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।**

তবে স্বামীজি বলেন, ধর্মের বহুত্বকে অপ্রয়োজনীয়রূপে অস্বীকার করা যাবে না। পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্মগুলি যে অতি প্রাচীনকাল থেকে আজও আছে এবং ক্রমশ প্রসারিত ও বর্ধিত হচ্ছে, এ কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। প্রয়োজন হল সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। প্রতিটি ধর্ম যদি পরমত সহনশীল হয় এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে ধর্মের বহুত্ব প্রয়োজনীয়। স্বামীজি বলেন, "সব মানুষকে এক মতাদর্শের সমর্থক করা যায় না, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এমনটা হতে পারেনি।" স্বামীজি সম্প্রদায়-বিরোধী নন, বরং সমর্থক। এর হেতুস্বরূপ স্বামীজি বলেন যে, মানুষমাত্রই একই চিন্তার অধিকারী হলে চিন্তা করার মতো আর কিছুই থাকে না—চিন্তা তার গতিকে হারিয়ে নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পরিণত হয়। গতি হল চিন্তার জীবন এবং গতি উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন দুই বা ততোধিক শক্তির সংঘাত। চিন্তার পৃথকীকরণই সংঘাত সৃষ্টি করে চিন্তাকে গতিশীল করে। সব মানুষ একইভাবে চিন্তা করলে তারা প্রত্যেকেই 'সংগ্রহশালায় অথবা জাদুঘরে রক্ষিত মিশরীয় মমি'তে পরিণত হয়ে কেবল শূন্যদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকবে। তেমনি স্বামীজি বলেন, "যখন কোনো ধর্মসম্প্রদায় থাকে না তখন ধর্মও হয়ে পড়ে প্রাণহীন যেখানে সমাধিগহ্বরের নিশ্চল শান্তি ও সম্প্রীতি থাকলেও প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না।" কাজেই, সত্য হল— যতদিন মানবজাতি চিন্তা করবে, যতদিন তাদের চিন্তাশক্তি থাকবে, ততদিন সম্প্রদায় থাকবে। পার্থক্য বা বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ এবং লক্ষ্য।

তাহলে প্রশ্ন হল—কীভাবে এতসব সংঘাতময় বৈচিত্র্য সত্য হতে পারে? যদি একটা চিন্তাধারা সত্য হয়, তাহলে তার বিরোধী চিন্তাধারা একইসঙ্গে কীভাবে সত্য হবে? স্বামীজি তাঁর বিশ্লেষণী মননের সাহায্যে এই জটিল সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর বিরোধী নয়— তাদের মধ্যে এক **সাধারণ যোগসূত্র** আছে। এই যোগসূত্রের জন্যই, স্বামীজি বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্বের বড়ো বড়ো প্রতিটি ধর্মই মহান বিশ্বসত্যের এক একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছে। এটা হচ্ছে সংযোজন, বিয়োজন নয়। বিভিন্ন ধর্মে তত্ত্বের পর তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, আদর্শের পর আদর্শের সংযোজন হয়েছে। এই সংযোজন ভ্রান্তি থেকে প্রগতির পথ ধরে হয় না, তা হয় এক সত্য থেকে অন্য এক সত্যের পথে। বিভিন্ন মানুষ একই বিষয়কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে না, দেখে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। মূলত এজন্যই একই মহাসত্যকে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে কোনো দোষ নেই, কেননা প্রতিটি ধর্ম সত্যের এক একটি দিককে প্রকাশ করে। দোষ হল সংকীর্ণমন্যতায়, অসহিষ্ণুতায়, দোষ হল, অংশকে সমগ্ররূপে দাবি করার মধ্যে; খণ্ড, ক্ষুদ্র, সীমায়িতকে অসীম ও অনন্তরূপে দাবি করার মধ্যে। অনেক ধর্মসম্প্রদায় দাবি করে যে, ঈশ্বরের অনন্ত সত্যের সবটুকু কেবল তারাই জানতে পেরেছে, অপরে নয়। এ এক মিথ্যা অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, দম্ভ। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মানুষের সাধ্যাতীত— কোনো ধর্মগ্রন্থেই তা সম্ভব হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন, "ঈশ্বরের গ্রন্থরচনার (যথা—বাইবেল, কুরআন)

১ বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র—প্রথম খণ্ড : বিশ্বধর্মের আদর্শ। পৃ- ৬২১।

ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে আপাতদৃষ্টিতে তাই এটাই মনে হয় যে, বিশ্বধর্ম বা বিশ্বজনীন ধর্ম একটা আদর্শমাত্র, যে আদর্শকে কিছু শুদ্ধচিত্ত ধর্মপ্রাণ মানুষ যুগে যুগে নানা দেশে ও নানাভাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং যে আদর্শকে অদ্যাপি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি। বাস্তবায়িত না হওয়ার হেতু হল, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নির্বিচারবাদ, গোড়ামি। প্রত্যেক ধর্ম অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় তার নিজস্ব মতবাদ বা তত্ত্বসমূহকে প্রকাশ করে জোরের সঙ্গে দাবি করে যে, তার মতবাদ বা তত্ত্বই একমাত্র সত্য। ঐসব ধর্ম-সম্প্রদায়ের সদস্যরা আরও মনে করে যে, তাদের তত্ত্বে বিশ্বাস না করলে অবিশ্বাসীদের ভয়ঙ্কর নরকযন্ত্রণাভোগ অনিবার্য। অনেকে আবার, বল প্রয়োগ ক'রে, তরবারি বার ক'রে অবিশ্বাসীদের তাদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।[১] স্বামীজি বলেন, এটা কোনো কুপ্রবৃত্তি থেকে হয় না। এটা হয় মস্তিষ্কের একটা বিশেষ রোগ থেকে যাকে বলা হয় ধর্মোন্মত্ততা। ...**এই ধর্মোন্মাদ রোগ সব রোগের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক।**

তবে স্বামীজি বলেন, ধর্মের বহুত্বকে অপ্রয়োজনীয়রূপে অস্বীকার করা যাবে না। পৃথিবীর বড়ো বড়ো ধর্মগুলি যে অতি প্রাচীনকাল থেকে আজও আছে এবং ক্রমশ প্রসারিত ও বর্ধিত হচ্ছে, এ কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। প্রয়োজন হল সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব। প্রতিটি ধর্ম যদি পরমত সহনশীল হয় এবং পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তাহলে ধর্মের বহুত্ব প্রয়োজনীয়। স্বামীজি বলেন, "সব মানুষকে এক মতাদর্শের সমর্থক করা যায় না, এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এমনটা হতে পারেনি।" স্বামীজি সম্প্রদায়-বিরোধী নন, বরং সমর্থক। এর হেতুস্বরূপ স্বামীজি বলেন যে, মানুষমাত্রই একই চিন্তার অধিকারী হলে চিন্তা করার মতো আর কিছুই থাকে না—চিন্তা তার গতিকে হারিয়ে নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পরিণত হয়। গতি হল চিন্তার জীবন এবং গতি উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন দুই বা ততোধিক শক্তির সংঘাত। চিন্তার পৃথকীকরণই সংঘাত সৃষ্টি করে চিন্তাকে গতিশীল করে। সব মানুষ একইভাবে চিন্তা করলে তারা প্রত্যেকেই 'সংগ্রহশালায় অথবা জাদুঘরে রক্ষিত মিশরীয় মমি'তে পরিণত হয়ে কেবল শূন্যদৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে চেয়ে থাকবে। তেমনি স্বামীজি বলেন, "যখন কোনো ধর্মসম্প্রদায় থাকে না তখন ধর্মও হয়ে পড়ে প্রাণহীন যেখানে সমাধিগহ্বরের নিশ্চল শান্তি ও সম্প্রীতি থাকলেও প্রাণচাঞ্চল্য থাকে না।" কাজেই, সত্য হল— যতদিন মানবজাতি চিন্তা করবে, যতদিন তাদের চিন্তাশক্তি থাকবে, ততদিন সম্প্রদায় থাকবে। পার্থক্য বা বৈচিত্র্যই জীবনের লক্ষণ এবং লক্ষ্য।

তাহলে প্রশ্ন হল—কীভাবে এতসব সংঘাতময় বৈচিত্র্য সত্য হতে পারে? যদি একটা চিন্তাধারা সত্য হয়, তাহলে তার বিরোধী চিন্তাধারা একইসঙ্গে কীভাবে সত্য হবে? স্বামীজি তাঁর বিশ্লেষণী মননের সাহায্যে এই জটিল সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে বলেছেন, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা পরস্পর বিরোধী নয়— তাদের মধ্যে এক **সাধারণ যোগসূত্র** আছে। এই যোগসূত্রের জন্যই, স্বামীজি বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন ধর্মগুলি পরস্পর বিরোধী হওয়ার পরিবর্তে তারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্বের বড়ো বড়ো প্রতিটি ধর্মই মহান বিশ্বসত্যের এক একটি দিকের প্রতি আলোকপাত করেছে। এটা হচ্ছে সংযোজন, বিয়োজন নয়। বিভিন্ন ধর্মে তত্ত্বের পর তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে, আদর্শের পর আদর্শের সংযোজন হয়েছে। এই সংযোজন ভ্রান্তি থেকে প্রগতির পথ ধরে হয় না, তা হয় এক সত্য থেকে অন্য এক সত্যের পথে। বিভিন্ন মানুষ একই বিষয়কে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে না, দেখে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। মূলত এজন্যই একই মহাসত্যকে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে কোনো দোষ নেই, কেননা প্রতিটি ধর্ম সত্যের এক একটি দিককে প্রকাশ করে। দোষ হল সংকীর্ণমন্যতায়, অসহিষ্ণুতায়, দোষ হল, অংশকে সমগ্ররূপে দাবি করার মধ্যে; খণ্ড, ক্ষুদ্র, সীমায়িতকে অসীম ও অনন্তরূপে দাবি করার মধ্যে। অনেক ধর্মসম্প্রদায় দাবি করে যে, ঈশ্বরের অনন্ত সত্যের সবটুকু কেবল তারাই জানতে পেরেছে, অপরে নয়। এ এক মিথ্যা অহমিকা, আত্মম্ভরিতা, দম্ভ। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া মানুষের সাধ্যাতীত— কোনো ধর্মগ্রন্থেই তা সম্ভব হতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন, "ঈশ্বরের গ্রন্থরচনার (যথা—বাইবেল, কুরআন)

১ বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র—প্রথম খণ্ড : বিশ্বধর্মের আদর্শ। পৃ- ৬২১।

কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? না কি সে গ্রন্থের মাধ্যমে উপলব্ধির প্রকাশ ক্রমাগতই হয়ে চলেছে? এ এক অপূর্ব গ্রন্থ ... বেদ, বাইবেল, কুরআন এবং অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থ সেই গ্রন্থেরই অনেকগুলি পৃষ্ঠামাত্র। আরও অনেক পৃষ্ঠা এখনো খোলা হয়নি, সেগুলি খুলতে হবে।"[১]

এখন প্রশ্ন হল, **বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করে বিশ্বজনীন ধর্ম বা বিশ্বধর্ম কি সম্ভব?** প্রতিটি দেশের দার্শনিকগণ এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন ধর্মকে সমন্বিত করে যে বিশ্বধর্মের স্বপ্ন দেখেছেন তা ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে সমস্ত ধর্মের একীকরণ বিশ্বধর্মের আদর্শ হতে পারে না। বৈচিত্র্যকে, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ভিন্নতাকে, স্বীকার করেই বিশ্বধর্মের পরিকল্পনা করতে হবে এবং স্বামীজির মতে এমন বিশ্বজনীন ধর্ম—আদর্শ ধর্ম কেবল অনালব্ধ আদর্শ মাত্র নয়, তা বাস্তবিক প্রথম দিন থেকেই আছে। আদর্শ বিশ্বধর্ম ধর্ম-বৈচিত্র্যকে, বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না, যদিও সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যসূত্রের প্রতি আলোকপাত করে, সব ধর্মের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও তাদের মিলনকেও সম্ভব করে। একমাত্র **এমন কোনো ধর্মকেই— যা ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট না করেও তাদের মিলনের পথ নির্দেশ করে— বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য করা যাবে এবং এমন ধর্ম বাস্তবিকই আছে।**

স্বামীজির মতে, অদ্বৈত বেদান্তসম্মত হিন্দুধর্ম এমনই এক ধর্ম যেখানে বিশ্বজনীন ধর্মের বীজ নিহিত আছে। এখানে ধর্মের ঈশ্বর বহিঃস্যূত নয়, অন্তঃস্যূত; প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরমসৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। বেদান্ত মতে, মানুষ স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান। মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, যে আত্মা সর্বভূতে, সর্বজীবে অধিষ্ঠিত। **মানুষের এই স্বরূপ উপলব্ধিই হল মানুষের ধর্ম।** সভ্যতার উষাকাল থেকে অদ্যাবধি, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, মানুষ এই স্বরূপ উপলব্ধিরই চেষ্টা করে চলেছে। **এই স্বরূপ উপলব্ধিই সব ধর্মের সব মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য।** বেদান্ত মতে তাই, মানুষের স্বরূপ উপলব্ধির সকল প্রকার আয়াস-প্রয়াসই ধর্মের অন্তর্গত। অর্থাৎ সব ধর্মের চরম লক্ষ্য হল আত্মাতেই ঈশ্বর-উপলব্ধি। 'যত মত তত পথ', যদিও গন্তব্য বা লক্ষ্য অভিন্ন—**সব ধর্মমতে আত্মোপলব্ধিই ধর্মের অভীষ্ট।**

স্বামীজি বিশ্বাস করেন যে, ধর্মকে এভাবে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তসম্মতভাবে গ্রহণ করলে, অধ্যাত্মবাদের পাদপীঠে সব ধর্ম, তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, মিলিত হতে পারে। এমন বিশ্বজনীন ধর্মে সংকীর্ণতার স্থান নেই; গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতার কোনো স্থান নেই। এমন ধর্ম সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিবাদ-বিসংবাদ, পরমত অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শ বিশ্বজনীন বেদান্তসম্মত ধর্মের পরিপন্থী। এখানে 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।[২] উপনিষদসম্মত অদ্বৈতবেদান্তধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারকরূপে স্বামীজি বলেন, "আমি সব ধর্মের উপাসকদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব, আমি খ্রিস্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করব; আমি বৌদ্ধদের মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের শরণ নেব এবং তাঁর নীতি-উপদেশ গ্রহণ করব। আমি অরণ্যে গিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বসে ধ্যান করব যে হিন্দু সেই পরমজ্যোতিকে দেখার জন্য সাধনা করেছেন, যে জ্যোতির দ্বারা পৃথিবীর সব মানুষের অন্তর আলোকিত।"[৩]

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ধর্ম হল উপলব্ধি, আত্ম-উপলব্ধি, নিজমধ্যে পরমসত্তার উপলব্ধি। ধর্ম কোনো বাক্যবিস্তার বা আলোচনা নয়, কোনো মতবাদ বা তত্ত্ব নয়, সে তত্ত্ব বা মতবাদ যত সুন্দরই হোক না কেন। **ধর্ম হল অপরোক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে সত্য হওয়া এবং হয়ে ওঠা। সমগ্র অন্তরাত্মা যখন পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে বিশ্বাসের বস্তুতে পরিণত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে প্রকৃত ধর্ম—বিশ্বজনীনধর্ম।** এমন ধর্মের সমর্থক তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারে, না হতেও পারে; পৌত্তলিক হতে পারে, না হতেও পারে; হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি যে-কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হতে পারে। বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গীতোক্ত ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র

১. পূর্ববৎ। বিশ্বধর্মের উপলব্ধির পথ। পৃ- ৬১৮।
২. ঐ

কাজ কি শেষ হয়ে গেছে? না কি সে গ্রন্থের মাধ্যমে উপলব্ধির প্রকাশ ক্রমাগতই হয়ে চলেছে? এ এক অপূর্ব গ্রন্থ ... বেদ, বাইবেল, কুরআন এবং অন্যান্য সব ধর্মগ্রন্থ সেই গ্রন্থেরই অনেকগুলি পৃষ্ঠামাত্র। আরও অনেক পৃষ্ঠা এখনো খোলা হয়নি, সেগুলি খুলতে হবে।"[১]

এখন প্রশ্ন হল, **বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করে বিশ্বজনীন ধর্ম বা বিশ্বধর্ম কি সম্ভব?** প্রতিটি দেশের দার্শনিকগণ এবং অন্যান্যরা বিভিন্ন ধর্মকে সমন্বিত করে যে বিশ্বধর্মের স্বপ্ন দেখেছেন তা ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে সমস্ত ধর্মের একীকরণ বিশ্বধর্মের আদর্শ হতে পারে না। বৈচিত্র্যকে, এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ভিন্নতাকে, স্বীকার করেই বিশ্বধর্মের পরিকল্পনা করতে হবে এবং স্বামীজির মতে এমন বিশ্বজনীন ধর্ম—আদর্শ ধর্ম কেবল অনালব্ধ আদর্শ মাত্র নয়, তা বাস্তবিক প্রথম দিন থেকেই আছে। আদর্শ বিশ্বধর্ম ধর্ম-বৈচিত্র্যকে, বৈচিত্র্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে না, যদিও সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যসূত্রের প্রতি আলোকপাত করে, সব ধর্মের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও তাদের মিলনকেও সম্ভব করে। একমাত্র **এমন কোনো ধর্মকেই— যা ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে, তার ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট না করেও তাদের মিলনের পথ নির্দেশ করে— বিশ্বজনীন ধর্মরূপে গণ্য করা যাবে এবং এমন ধর্ম বাস্তবিকই আছে।**

স্বামীজির মতে, অদ্বৈত বেদান্তসম্মত হিন্দুধর্ম এমনই এক ধর্ম যেখানে বিশ্বজনীন ধর্মের বীজ নিহিত আছে। এখানে ধর্মের ঈশ্বর বহিঃস্যূত নয়, অন্তঃস্যূত; প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরমসৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। বেদান্ত মতে, মানুষ স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান। মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, যে আত্মা সর্বভূতে, সর্বজীবে অধিষ্ঠিত। **মানুষের এই স্বরূপ উপলব্ধিই হল মানুষের ধর্ম।** সভ্যতার উষাকাল থেকে অদ্যাবধি, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, মানুষ এই স্বরূপ উপলব্ধিরই চেষ্টা করে চলেছে। **এই স্বরূপ উপলব্ধিই সব ধর্মের সব মানুষের চিরন্তন লক্ষ্য।** বেদান্ত মতে তাই, মানুষের স্বরূপ উপলব্ধির সকল প্রকার আয়াস-প্রয়াসই ধর্মের অন্তর্গত। অর্থাৎ সব ধর্মের চরম লক্ষ্য হল আত্মাতেই ঈশ্বর-উপলব্ধি। 'যত মত তত পথ', যদিও গন্তব্য বা লক্ষ্য অভিন্ন—**সব ধর্মমতে আত্মোপলব্ধিই ধর্মের অভীষ্ট।**

স্বামীজি বিশ্বাস করেন যে, ধর্মকে এভাবে অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তসম্মতভাবে গ্রহণ করলে, অধ্যাত্মবাদের পাদপীঠে সব ধর্ম, তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে, মিলিত হতে পারে। এমন বিশ্বজনীন ধর্মে সংকীর্ণতার স্থান নেই; গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ও অনুদারতার কোনো স্থান নেই। এমন ধর্ম সব ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিবাদ-বিসংবাদ, পরমত অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি আদর্শ বিশ্বজনীন বেদান্তসম্মত ধর্মের পরিপন্থী। এখানে 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি'।[২] উপনিষদসম্মত অদ্বৈতবেদান্তধর্মের পৃষ্ঠপোষক ও প্রচারকরূপে স্বামীজি বলেন, "আমি সব ধর্মের উপাসকদের সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি মুসলমানদের মসজিদে যাব, আমি খ্রিস্টানদের গীর্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করব; আমি বৌদ্ধদের মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধের শরণ নেব এবং তাঁর নীতি-উপদেশ গ্রহণ করব। আমি অরণ্যে গিয়ে হিন্দুদের সঙ্গে বসে ধ্যান করব যে হিন্দু সেই পরমজ্যোতিকে দেখার জন্য সাধনা করেছেন, যে জ্যোতির দ্বারা পৃথিবীর সব মানুষের অন্তর আলোকিত।"[৩]

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, ধর্ম হল উপলব্ধি, আত্ম-উপলব্ধি, নিজমধ্যে পরমসত্তার উপলব্ধি। ধর্ম কোনো বাক্যবিস্তার বা আলোচনা নয়, কোনো মতবাদ বা তত্ত্ব নয়, সে তত্ত্ব বা মতবাদ যত সুন্দরই হোক না কেন। **ধর্ম হল অপরোক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে সত্য হওয়া এবং হয়ে ওঠা। সমগ্র অন্তরাত্মা যখন পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে বিশ্বাসের বস্তুতে পরিণত হয়, তখনই তা হয়ে ওঠে প্রকৃত ধর্ম—বিশ্বজনীনধর্ম।** এমন ধর্মের সমর্থক তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হতে পারে, না হতেও পারে; পৌত্তলিক হতে পারে, না হতেও পারে; হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ইত্যাদি যে-কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ হতে পারে। বেদান্তদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য গীতোক্ত ধর্ম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র

১. পূর্ববৎ। বিশ্বধর্মের উপলব্ধির পথ। পৃ- ৬১৮।
২. ঐ

বলেছেন, "এ ধর্ম সব দেশের সব মানুষের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে এটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তার কাছেও এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে তার কাছে এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে ভক্তি না করে, তার কাছেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার কাছে এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে বিশ্বাস করে না তার কাছেও এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ...এমন বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয়নি।"[১]

দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সব মানুষের অন্তরে একই মূল সত্য ব্রহ্মের অবস্থান, সব মানুষের সব ক্রিয়াকর্মে একই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ —এমন উপলব্ধি হলে, বেদান্ত মতে,মানুষে মানুষে আর বৈরীভাব থাকে না, একে একে সব ভেদ অপসৃত হয়ে বিশ্বপ্রেমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব জাগ্রত হয়, সব মানুষের মিলনভূমিতে, মহামানবতায় পরিণত হয় আর, ব্যক্তিভেদ মানব-সিন্ধুতে বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হয়। নিজ মধ্যে এ প্রকারে ব্রহ্মোপলব্ধি হলে সকল প্রকার ভেদ—নরনারীর লিঙ্গভেদ, মানুষে মানুষে মতভেদ, বর্ণভেদ, উচ্চ-নীচ-জাতিভেদ প্রভৃতি অপসৃত হয়; এবং এ প্রকারে ভেদ-বৈষম্যের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে ব্যক্তিমানুষ মহামানবতার আস্বাদন লাভ করে, অর্থাৎ নিজ মধ্যে ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎ লাভ করে। এমন অবস্থাতেই মানুষের ধর্ম, বেদান্তসম্মতভাবে, বিশ্বজনীন হয় এবং মানুষের জগতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। স্বামীজি বলেন, এভাবে কোনো মানুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে 'তবেই সেই ব্যক্তিকে প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।'[২] প্রকৃত বৈদান্তিক হিন্দু হতে পারেন, নাও হতে পারেন; ঈশ্বরবাদী হতে পারেন, নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন। নিজ মধ্যে সর্বভূতে বিরাজমান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি প্রকৃত বৈদান্তিক।

উল্লেখযোগ্য যে, **বিশ্বজনীন ধর্মে এই প্রকারে ধর্মসমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের একীকরণ নয় অথবা বিভিন্ন ধর্মের অংশ-বিশেষ চয়ন নয়। এই সমন্বয় হল, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র বিদ্যমান থাকে তার স্পষ্টীকরণ।** সব ধর্মেই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার উল্লেখ আছে—কোনো ধর্মে মানুষকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কোনো ধর্মে মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যরূপে আবার কোনো ধর্মে মানুষকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হয়, আবার কোনো ধর্মে মানুষকে অনন্ত দৈবশক্তির ধারকরূপে গণ্য করা হয়। এভাবে, প্রতিটি ধর্মে **মানুষের স্বরূপ কথনই** হল ওইসব ধর্মের যোগসূত্র। কাজেই, **ধর্মসমন্বয় হল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার সমন্বয়, যা প্রত্যেক মানুষকে তার স্বধর্ম আত্মোপলব্ধিকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করে** এবং ফলত পরমতকে নিজমতরূপে গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। জগতের সব জাতি, সব ধর্ম যে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ, অদ্বৈতবেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামীজি তা একান্তভাবে উপলব্ধি করে অপরকেও উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করেছেন। সুদূর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে আমেরিকাবাসীদের কাছে বক্তৃতামালার মাধ্যমে স্বামীজি এই বিশ্বজনীন ধর্মকেই নানা ভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করেছেন। এক ও অখণ্ড আনন্দময় সত্তা থেকে বিশ্বভুবনের উৎপত্তি, এমন উপলব্ধি হলে 'সব মানুষ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়; বৈরীভাব অপসৃত হয়। উপনিষদের ব্রহ্ম বা আত্মাই হল এই আনন্দস্বরূপ। ঋষি বলেছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

'পরম সৎ সেই আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম থেকেই সমস্ত প্রাণীর জন্ম—'সেই সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার দ্বারাই জীবকুল জীবিত আছে, সেই সর্বময় আনন্দের মধ্যেই তারা গমন করে।' ঋষি আরও বলেছেন—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

১. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষর দূরীকরণ সমিতি। পৃ- ৯৬৯।
২. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র। ৩য় খণ্ড। পৃ. ২৪৪।

বলেছেন, "এ ধর্ম সব দেশের সব মানুষের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তার পক্ষে এটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তার কাছেও এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে তার কাছে এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে ভক্তি না করে, তার কাছেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে তার কাছে এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যে বিশ্বাস করে না তার কাছেও এটা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ...এমন বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয়নি।"[১]

দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সব মানুষের অন্তরে একই মূল সত্য ব্রহ্মের অবস্থান, সব মানুষের সব ক্রিয়াকর্মে একই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ —এমন উপলব্ধি হলে, বেদান্ত মতে,মানুষে মানুষে আর বৈরীভাব থাকে না, একে একে সব ভেদ অপসৃত হয়ে বিশ্বপ্রেমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব জাগ্রত হয়, সব মানুষের মিলনভূমিতে, মহামানবতায় পরিণত হয় আর, ব্যক্তিভেদ মানব-সিন্ধুতে বুদ্‌বুদের মতো বিলীন হয়। নিজ মধ্যে এ প্রকারে ব্রহ্মোপলব্ধি হলে সকল প্রকার ভেদ—নরনারীর লিঙ্গভেদ, মানুষে মানুষে মতভেদ, বর্ণভেদ, উচ্চ-নীচ-জাতিভেদ প্রভৃতি অপসৃত হয়; এবং এ প্রকারে ভেদ-বৈষম্যের ঊর্ধ্বে অবস্থান করে ব্যক্তিমানুষ মহামানবতার আস্বাদন লাভ করে, অর্থাৎ নিজ মধ্যে ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎ লাভ করে। এমন অবস্থাতেই মানুষের ধর্ম, বেদান্তসম্মতভাবে, বিশ্বজনীন হয় এবং মানুষের জগতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। স্বামীজি বলেন, এভাবে কোনো মানুষের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হলে 'তবেই সেই ব্যক্তিকে প্রকৃত বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে।'[২] প্রকৃত বৈদান্তিক হিন্দু হতে পারেন, নাও হতে পারেন; ঈশ্বরবাদী হতে পারেন, নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন। নিজ মধ্যে সর্বভূতে বিরাজমান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি প্রকৃত বৈদান্তিক।

উল্লেখযোগ্য যে, **বিশ্বজনীন ধর্মে এই প্রকারে ধর্মসমন্বয় বিভিন্ন ধর্মের একীকরণ নয় অথবা বিভিন্ন ধর্মের অংশ-বিশেষ চয়ন নয়। এই সমন্বয় হল, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্যসূত্র বিদ্যমান থাকে তার স্পষ্টীকরণ।** সব ধর্মেই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার উল্লেখ আছে—কোনো ধর্মে মানুষকে ঈশ্বরের পুত্ররূপে, কোনো ধর্মে মানুষকে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যরূপে আবার কোনো ধর্মে মানুষকে স্বয়ং ঈশ্বররূপে কল্পনা করা হয়, আবার কোনো ধর্মে মানুষকে অনন্ত দৈবশক্তির ধারকরূপে গণ্য করা হয়। এভাবে, প্রতিটি ধর্মে **মানুষের স্বরূপ কথনই** হল ওইসব ধর্মের যোগসূত্র। কাজেই, **ধর্মসমন্বয় হল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবসত্তার সমন্বয়, যা প্রত্যেক মানুষকে তার স্বধর্ম আত্মোপলব্ধিকে আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করে** এবং ফলত পরমতকে নিজমতরূপে গ্রহণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে। জগতের সব জাতি, সব ধর্ম যে এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ, অদ্বৈতবেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামীজি তা একান্তভাবে উপলব্ধি করে অপরকেও উপলব্ধি করতে উৎসাহিত করেছেন। সুদূর আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে আমেরিকাবাসীদের কাছে বক্তৃতামালার মাধ্যমে স্বামীজি এই বিশ্বজনীন ধর্মকেই নানা ভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করেছেন। এক ও অখণ্ড আনন্দময় সত্তা থেকে বিশ্বভুবনের উৎপত্তি, এমন উপলব্ধি হলে 'সব মানুষ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়; বৈরীভাব অপসৃত হয়। উপনিষদের ব্রহ্ম বা আত্মাই হল এই আনন্দস্বরূপ। ঋষি বলেছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

'পরম সৎ সেই আনন্দময় আত্মা বা ব্রহ্ম থেকেই সমস্ত প্রাণীর জন্ম—'সেই সর্বব্যাপী আনন্দময় সত্তার দ্বারাই জীবকুল জীবিত আছে, সেই সর্বময় আনন্দের মধ্যেই তারা গমন করে।' ঋষি আরও বলেছেন—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতিমধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

১. শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষর দূরীকরণ সমিতি। পৃ- ৯৬৯।
২. বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র। ৩য় খণ্ড। পৃ. ২৪৪।

বাতাস মধু অর্থাৎ আনন্দ বহন করছে। নদী, সমুদ্র সবই আনন্দ ক্ষরণ করছে। ওষধি, বনস্পতি, আনন্দময় হয়ে উঠছে। রাত্রি, প্রভাত, পৃথিবীর ধূলিকণা, সূর্য সবই আনন্দময় হয়ে উঠুক। **এমন বিশ্বলৌকিক ধর্মকে, স্বামীজি বলেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে।**

৩.৩. যোগ
Yoga

আত্মার আবশ্যিক ধর্ম হল মুক্তি। আত্মা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েই আছে, মুক্তি তার স্বরূপ। তবে যা প্রাপ্ত হয়েই আছে, যা তার স্বরূপ সেই বিষয়টি আত্মা বিস্মৃত হয়ে আছে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নয়। স্বরূপ বিস্মরণের কারণে আত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন এবং বদ্ধ ভাবে। **মুক্তি হল এই বিস্মরণের অবসান।** নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্মৃতি দূর হলে আত্মা নিজেকে দেহ থেকে আলাদা হিসেবে অনুভব করে। তার এই উপলব্ধি হয় দুঃখ-সুখ-দুর্দশা-যন্ত্রনা ইত্যাদি দেহের ধর্ম, আত্মার নয়। এই উপলব্ধিই হল মুক্তি বা মোক্ষ। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে। আত্মা যেহেতু দেহ নয় তাই আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীন নয়, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। মুক্ত আত্মা অমর।

ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় দেহ, তার জন্ম এবং মৃত্যুই প্রত্যক্ষের বিষয়। স্বভাবতই আত্মা এবং তার অমরতার কোনো প্রমাণ জীবনের কাছে নেই। বিবেকানন্দও স্বীকার করেন আত্মার অমরতা বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতির জগতে এই ধারণাটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার অমরতার ধারণাটিকে অবৈজ্ঞানিক বা আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়াও সংগত নয়। নৈতিকতার জগতেও এই ধারণাটির ইতিবাচক অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সর্বযুগেই চিন্তকরা এই ধারণার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য, আত্মার অমরতার সমর্থনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না দেওয়া গেলেও তা বৈধভাবে অনুমান করা যায়। আত্মা সাবয়ব বা অংশযুক্ত নয়, সরল। কাজেই অবয়ব বিয়োজনের মাধ্যমে তার ধ্বংসের বা মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের মধ্যে অসংখ্য সম্ভাবনার বাস্তবায়নও আত্মার ধারাবাহিক অস্তিত্ব বা অমরতার নির্দেশক। সর্বোপরি মৃত্যুকে জয় করার যে প্রয়াস মানব জাতির উন্মেষের ঊষালগ্ন থেকেই দেখা যায় তার ভিত্তিতে অমরতার বাস্তবতা অনুমান করলে তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

আত্মার অস্তিত্ব এবং তার অমরতা স্বীকার করে নিলে আমাদের একটি অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—কীভাবে, কোন্ প্রক্রিয়ায় আত্মা অমরতাকে বাস্তবায়িত করতে, উপলব্ধি করতে পারে? এই প্রশ্নের যে উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন তা হল, 'যোগ' অর্থাৎ যোগের মাধ্যমেই আত্মা অমরতা উপলব্ধি করতে পারে। 'যোগ' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'যোগ' বলতে যুক্ত হওয়া যেমন বোঝায়, তেমনই বিশেষ এক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকেও বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'যোগ' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ এই দুটির কোনো একটিমাত্র অর্থে গ্রহণ করেননি। বিবেকানন্দ যে ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন তা 'যুক্ত হওয়া' এবং 'পদ্ধতি' উভয়কেই বোঝায়। বিবেকানন্দ ব্যবহৃত অর্থে 'যোগ' কতিপয় পদ্ধতিকে বোঝায়, যে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারী 'যোগ' প্রাপ্ত হবেন বা যুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিগুলি কখনও-কখনও জ্ঞানাত্মক, কখনও সেগুলিতে ভক্তির প্রাধান্য, আবার কখনও কর্মের। বিবেকানন্দের রচনায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ বিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

৩.৩.ক. জ্ঞানযোগ (Jnana Yoga)

জ্ঞানযোগে এই উপলব্ধি হয় বন্ধন বাস্তব সত্য নয়। অজ্ঞানতার কারণেই জীব নিজেকে বদ্ধ ভাবে। অজ্ঞানতা বলতে বোঝায় সৎ এবং অসৎ এই দুইয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করতে পারার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। অন্যভাবে বলা যায়, বিষয়ের প্রকৃত ধর্ম বুঝতে না পারাই হল অজ্ঞানতা। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা অজ্ঞানতার নিদর্শন। রজ্জু এবং সর্পের ভেদজ্ঞান না থাকার জন্য রজ্জু দেখে সর্পভীতি হয়। রজ্জুতে সর্প অসৎ কিন্তু রজ্জু সৎ। সৎ এবং অসৎ-এর ভেদজ্ঞান না থাকায় সৎ রজ্জুকে অসৎ সর্পরূপে প্রতীতি হয়। **কাজেই সৎ এবং অসৎ-এর**

বাতাস মধু অর্থাৎ আনন্দ বহন করছে। নদী, সমুদ্র সবই আনন্দ ক্ষরণ করছে। ওষধি, বনস্পতি, আনন্দময় হয়ে উঠছে। রাত্রি, প্রভাত, পৃথিবীর ধূলিকণা, সূর্য সবই আনন্দময় হয়ে উঠুক। **এমন বিশ্বলৌকিক ধর্মকে, স্বামীজি বলেন, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ, তাদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে।**

৩.৩. যোগ
Yoga

আত্মার আবশ্যিক ধর্ম হল মুক্তি। আত্মা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েই আছে, মুক্তি তার স্বরূপ। তবে যা প্রাপ্ত হয়েই আছে, যা তার স্বরূপ সেই বিষয়টি আত্মা বিস্মৃত হয়ে আছে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে বদ্ধ নয়। স্বরূপ বিস্মরণের কারণে আত্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে অভিন্ন এবং বদ্ধ ভাবে। **মুক্তি হল এই বিস্মরণের অবসান।** নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্মৃতি দূর হলে আত্মা নিজেকে দেহ থেকে আলাদা হিসেবে অনুভব করে। তার এই উপলব্ধি হয় দুঃখ-সুখ-দুর্দশা-যন্ত্রনা ইত্যাদি দেহের ধর্ম, আত্মার নয়। এই উপলব্ধিই হল মুক্তি বা মোক্ষ। দেহের জন্ম-মৃত্যু আছে। আত্মা যেহেতু দেহ নয় তাই আত্মা জন্ম-মৃত্যুর চক্রের অধীন নয়, আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। মুক্ত আত্মা অমর।

ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় দেহ, তার জন্ম এবং মৃত্যুই প্রত্যক্ষের বিষয়। স্বভাবতই আত্মা এবং তার অমরতার কোনো প্রমাণ জীবনের কাছে নেই। বিবেকানন্দও স্বীকার করেন আত্মার অমরতা বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতির জগতে এই ধারণাটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আত্মার অমরতার ধারণাটিকে অবৈজ্ঞানিক বা আজগুবি বলে উড়িয়ে দেওয়াও সংগত নয়। নৈতিকতার জগতেও এই ধারণাটির ইতিবাচক অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সর্বযুগেই চিন্তকরা এই ধারণার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে সচেষ্ট হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য, আত্মার অমরতার সমর্থনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না দেওয়া গেলেও তা বৈধভাবে অনুমান করা যায়। আত্মা সাবয়ব বা অংশযুক্ত নয়, সরল। কাজেই অবয়ব বিয়োজনের মাধ্যমে তার ধ্বংসের বা মৃত্যুর প্রশ্ন ওঠে না। মানুষের মধ্যে অসংখ্য সম্ভাবনার বাস্তবায়নও আত্মার ধারাবাহিক অস্তিত্ব বা অমরতার নির্দেশক। সর্বোপরি মৃত্যুকে জয় করার যে প্রয়াস মানব জাতির উন্মেষের ঊষালগ্ন থেকেই দেখা যায় তার ভিত্তিতে অমরতার বাস্তবতা অনুমান করলে তাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না।

আত্মার অস্তিত্ব এবং তার অমরতা স্বীকার করে নিলে আমাদের একটি অনিবার্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়—কীভাবে, কোন্ প্রক্রিয়ায় আত্মা অমরতাকে বাস্তবায়িত করতে, উপলব্ধি করতে পারে? এই প্রশ্নের যে উত্তর স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছেন তা হল, 'যোগ' অর্থাৎ যোগের মাধ্যমেই আত্মা অমরতা উপলব্ধি করতে পারে। 'যোগ' শব্দটি দ্ব্যর্থক। 'যোগ' বলতে যুক্ত হওয়া যেমন বোঝায়, তেমনই বিশেষ এক পদ্ধতি বা প্রক্রিয়াকেও বোঝায়। স্বামী বিবেকানন্দ 'যোগ' শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ এই দুটির কোনো একটিমাত্র অর্থে গ্রহণ করেননি। বিবেকানন্দ যে ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন তা 'যুক্ত হওয়া' এবং 'পদ্ধতি' উভয়কেই বোঝায়। বিবেকানন্দ ব্যবহৃত অর্থে 'যোগ' কতিপয় পদ্ধতিকে বোঝায়, যে পদ্ধতি প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারী 'যোগ' প্রাপ্ত হবেন বা যুক্ত হবেন। এই পদ্ধতিগুলি কখনও-কখনও জ্ঞানাত্মক, কখনও সেগুলিতে ভক্তির প্রাধান্য, আবার কখনও কর্মের। বিবেকানন্দের রচনায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ বিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়।

৩.৩.ক. জ্ঞানযোগ (Jnana Yoga)

জ্ঞানযোগে এই উপলব্ধি হয় বন্ধন বাস্তব সত্য নয়। অজ্ঞানতার কারণেই জীব নিজেকে বদ্ধ ভাবে। অজ্ঞানতা বলতে বোঝায় সৎ এবং অসৎ এই দুইয়ের প্রভেদ উপলব্ধি করতে পারার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। অন্যভাবে বলা যায়, বিষয়ের প্রকৃত ধর্ম বুঝতে না পারাই হল অজ্ঞানতা। রজ্জুকে সর্পজ্ঞান করা অজ্ঞানতার নিদর্শন। রজ্জু এবং সর্পের ভেদজ্ঞান না থাকার জন্য রজ্জু দেখে সর্পভীতি হয়। রজ্জুতে সর্প অসৎ কিন্তু রজ্জু সৎ। সৎ এবং অসৎ-এর ভেদজ্ঞান না থাকায় সৎ রজ্জুকে অসৎ সর্পরূপে প্রতীতি হয়। **কাজেই সৎ এবং অসৎ-এর**

প্রভেদ জানা জ্ঞানযোগীর পক্ষে আবশ্যক। জীবের নিজের জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, জগৎ ব্যবস্থায় সমস্ত কিছুর মধ্যে ঐক্যের জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে জ্ঞানযোগের পথ অনুসরণ করা যায় না। প্রাজ্ঞ শিক্ষকের ভাষণ শুনে বা বই পড়ে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত জ্ঞান তথ্যের ভাণ্ডারে সীমাবদ্ধ নয়। তথ্যের মধ্যে নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারলে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তথ্যে নিহিত সত্যে চিত্ত একাগ্র করতে পারলে শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হতে পারবে। এই দিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা গৌণ।

আত্মা যখন তার সম্পূর্ণ শক্তি কোনো একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করে তখন আত্মা একাগ্র হয়েছে বলা যায়। এই কাজটি সহজ নয়, অত্যন্ত দুরূহ। একাগ্র হবার ক্ষেত্রে আত্মাকে বিবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা আসে ইন্দ্রিয়সমূহের থেকে, দেহের ক্রিয়া থেকে, বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে। এইসব বিষয় থেকে আত্মাকে প্রত্যাহার করতে না পারলে একাগ্রতা সম্ভব নয়। কিন্তু দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে বিরত রেখে আত্মাকে অন্য সব কিছু থেকে প্রত্যাহার করে একাগ্রভাবে কোনো একটি বিষয়ে সংহত করা অতীব কঠিন। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে একাগ্র হওয়া সম্ভব নয়।

আত্মার শক্তিকে, একাগ্রতার বিষয় ভিন্ন, অন্য সবকিছু থেকে প্রত্যাহার করার পদ্ধতিটি হল ত্যাগ। সবরকমের স্বার্থপরতা এবং দেহ-মনের চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে ত্যাগের ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। **এইভাবে সবরকম আত্মপরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারা হল বৈরাগ্য।** বৈরাগ্য বা ত্যাগের ইতিবাচক দিকটি হল এই যে, বৈরাগ্য থাকলে অন্য কোনো কিছুর ভাবনার দ্বারা চালিত না হয়ে পরম কাম্য ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সর্বতোভাবে আকুল হওয়া যায়। জ্ঞানের জন্য এই আকুতি হল ত্যাগ বা বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ।

একবার আত্মার যাবতীয় শক্তিকে সংহত করে জ্ঞানের বিষয়ে সংহত করে একাগ্রতা অর্জন করার মানে এই নয় যে, এরপর থেকে প্রতিবারই জ্ঞানের বিষয়ে একাগ্র হওয়া সম্ভব হবে। বস্তুতপক্ষে একাগ্রতা অনুশীলনের বিষয়। অভ্যাসের মাধ্যমে একাগ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। **একাগ্রতা অভ্যাসের এই প্রক্রিয়াকে ধ্যান বলা হয়।** প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্যানের বিষয় হিসেবে যে-কোনো কিছুকেই নির্ধারণ করা যেতে পারে—কোনো বস্তু, ব্যক্তির প্রতিকৃতি, কোনো দেবতার মানসরূপ ইত্যাদি। নিয়ত অভ্যাসের মাধ্যমে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এক সময়ে জ্ঞানযোগী পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে সক্ষম হন। শক্তির বিপথে চালিত হওয়ার সবরকম প্রবণতাকে যখন তিনি রুদ্ধ করতে সক্ষম হন তখন ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। 'আমিই ব্রহ্ম' এই বোধটি তখন হয় এবং একাগ্রতার এই পর্যায়টিকে বলে সমাধি। ব্রহ্মের সাথে অভেদ অনুভবই হল জ্ঞানমার্গের অভীষ্ট।

৩.৩.খ. ভক্তিযোগ (Bhakti Yoga)

ভক্তিও মুক্তির পথ হতে পারে, ভক্তির মাধ্যমে আত্মার অমরতার অর্থাৎ তার নিত্যতা বিষয়ে অনুভব হতে পারে। ভক্তি এক শক্তিশালী আবেগ যা মানুষের মধ্যে থাকা শক্তি-সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্ত স্থায়ী ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে।"[১] ভক্তির মাধ্যমে আত্মশক্তির সক্রিয়তাকে এতটাই কার্যকর করে তোলা যায় যে তার দ্বারা ঈশ্বরকে জানা সম্ভব হয়। সাধারণ আবেগকে পরম শক্তিশালী আবেগে রূপান্তরিত করে সাধারণ ভালোবাসাকে পরম প্রেম তথা পরম নিবেদনে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ভক্তি জ্ঞানলাভের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে না। কারণ ভক্তি ও জ্ঞান স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য, "সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষে মিলিত হয়।"[২]

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন, মে ২০০২ ; পৃ. ৫।
২। তদেব, পৃ. ৫।

প্রভেদ জানা জ্ঞানযোগীর পক্ষে আবশ্যক। জীবের নিজের জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, জগৎ ব্যবস্থায় সমস্ত কিছুর মধ্যে ঐক্যের জ্ঞান হল যথার্থ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে জ্ঞানযোগের পথ অনুসরণ করা যায় না। প্রাজ্ঞ শিক্ষকের ভাষণ শুনে বা বই পড়ে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। প্রকৃত জ্ঞান তথ্যের ভাণ্ডারে সীমাবদ্ধ নয়। তথ্যের মধ্যে নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারলে জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। তথ্যে নিহিত সত্যে চিত্ত একাগ্র করতে পারলে শিক্ষার্থী জ্ঞানলাভের পথে অগ্রসর হতে পারবে। এই দিক থেকে বিচার করলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্যের ভূমিকা গৌণ।

আত্মা যখন তার সম্পূর্ণ শক্তি কোনো একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করে তখন আত্মা একাগ্র হয়েছে বলা যায়। এই কাজটি সহজ নয়, অত্যন্ত দুরূহ। একাগ্র হবার ক্ষেত্রে আত্মাকে বিবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এই বাধা আসে ইন্দ্রিয়সমূহের থেকে, দেহের ক্রিয়া থেকে, বিভিন্ন কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে। এইসব বিষয় থেকে আত্মাকে প্রত্যাহার করতে না পারলে একাগ্রতা সম্ভব নয়। কিন্তু দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে বিরত রেখে আত্মাকে অন্য সব কিছু থেকে প্রত্যাহার করে একাগ্রভাবে কোনো একটি বিষয়ে সংহত করা অতীব কঠিন। ইন্দ্রিয়সুখের বাসনাকে চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে একাগ্র হওয়া সম্ভব নয়।

আত্মার শক্তিকে, একাগ্রতার বিষয় ভিন্ন, অন্য সবকিছু থেকে প্রত্যাহার করার পদ্ধতিটি হল ত্যাগ। সবরকমের স্বার্থপরতা এবং দেহ-মনের চাহিদার ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলে ত্যাগের ক্ষমতা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। **এইভাবে সবরকম আত্মপরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারা হল বৈরাগ্য।** বৈরাগ্য বা ত্যাগের ইতিবাচক দিকটি হল এই যে, বৈরাগ্য থাকলে অন্য কোনো কিছুর ভাবনার দ্বারা চালিত না হয়ে পরম কাম্য ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সর্বতোভাবে আকুল হওয়া যায়। জ্ঞানের জন্য এই আকুতি হল ত্যাগ বা বৈরাগ্যের ফলস্বরূপ।

একবার আত্মার যাবতীয় শক্তিকে সংহত করে জ্ঞানের বিষয়ে সংহত করে একাগ্রতা অর্জন করার মানে এই নয় যে, এরপর থেকে প্রতিবারই জ্ঞানের বিষয়ে একাগ্র হওয়া সম্ভব হবে। বস্তুতপক্ষে একাগ্রতা অনুশীলনের বিষয়। অভ্যাসের মাধ্যমে একাগ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। **একাগ্রতা অভ্যাসের এই প্রক্রিয়াকে ধ্যান বলা হয়।** প্রাথমিক পর্যায়ে ধ্যানের বিষয় হিসেবে যে-কোনো কিছুকেই নির্ধারণ করা যেতে পারে—কোনো বস্তু, ব্যক্তির প্রতিকৃতি, কোনো দেবতার মানসরূপ ইত্যাদি। নিয়ত অভ্যাসের মাধ্যমে একাগ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং এক সময়ে জ্ঞানযোগী পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে সক্ষম হন। শক্তির বিপথে চালিত হওয়ার সবরকম প্রবণতাকে যখন তিনি রুদ্ধ করতে সক্ষম হন তখন ব্রহ্ম এবং আত্মার মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। 'আমিই ব্রহ্ম' এই বোধটি তখন হয় এবং একাগ্রতার এই পর্যায়টিকে বলে সমাধি। ব্রহ্মের সাথে অভেদ অনুভবই হল জ্ঞানমার্গের অভীষ্ট।

৩.৩.খ. ভক্তিযোগ (Bhakti Yoga)

ভক্তিও মুক্তির পথ হতে পারে, ভক্তির মাধ্যমে আত্মার অমরতার অর্থাৎ তার নিত্যতা বিষয়ে অনুভব হতে পারে। ভক্তি এক শক্তিশালী আবেগ যা মানুষের মধ্যে থাকা শক্তি-সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "অকপটভাবে ঈশ্বরানুসন্ধানই ভক্তিযোগ; প্রীতি ইহার আদি, মধ্য ও অন্ত। মুহূর্ত স্থায়ী ভগবৎ প্রেমোন্মত্ততা হইতেও শাশ্বতী মুক্তি আসিয়া থাকে।"[১] ভক্তির মাধ্যমে আত্মশক্তির সক্রিয়তাকে এতটাই কার্যকর করে তোলা যায় যে তার দ্বারা ঈশ্বরকে জানা সম্ভব হয়। সাধারণ আবেগকে পরম শক্তিশালী আবেগে রূপান্তরিত করে সাধারণ ভালোবাসাকে পরম প্রেম তথা পরম নিবেদনে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ভক্তি জ্ঞানলাভের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে না। কারণ ভক্তি ও জ্ঞান স্বতন্ত্র। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য, "সাধারণতঃ লোকে জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে যতটা পার্থক্য আছে মনে করে, বাস্তবিক তাহা নাই। ক্রমশঃ বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে একই লক্ষে মিলিত হয়।"[২]

১। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা* চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন, মে ২০০২ ; পৃ. ৫।
২। তদেব, পৃ. ৫।

ভক্তি বা নিবেদনের **প্রেমময় মনোভাব** প্রতিটি মানুষের সহজাত। ভক্তিকে যখন যোগ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে তখন সেই ভক্তি বা নিবেদনের প্রেমময় মনোভাবটি ঈশ্বরে উদ্দিষ্ট এবং বিবেকানন্দ বলছেন, "ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।"[১] সাধারণত আমাদের ভক্তি বা নিবেদনের প্রেমময় মনোভাব সসীম ও নশ্বর বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের ভালোবাসাও নশ্বর, সসীম, সৎ নয়। কিন্তু ভক্তিযোগে আমাদের ভক্তি বা প্রেম সসীম বা নশ্বর নয়। কেননা এই ক্ষেত্রে ভক্তি বা প্রেমের উদ্দিষ্ট সসীম নয়, নশ্বর নয়। এক্ষেত্রে ভালোবাসা বা ভক্তির বিষয় হল পরম সত্তা, যা অসীম এবং অবিনশ্বর (এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্র-গানের পঙ্‌ক্তি: "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে")। এই প্রেম হল সার্বিক প্রেম, যা খণ্ডিত নয়, কোনো ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়।

ভক্তিযোগের বিভিন্ন স্তরের কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। এই স্তর পরম্পরায় ভক্তি ঈশ্বরজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। **প্রথম স্তরে** ভক্তি বাহ্য কোনো বিষয়কে উদ্দেশ্য করে। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম কোনো রূপ কল্পনা করতে পারে না। তাই তার ভক্তি বা পূজার বিষয়টি হয় স্থূল। দেবতার মূর্তি কল্পনা করে, মূর্তি নির্মাণ করে সে তার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে। কখনও-কখনও মানুষে দেবত্ব আরোপ করেও সে পূজা করে থাকে। মূর্তি পূজা বাহ্যবস্তুতে ভক্তি নিবেদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। ভক্তিযোগের **পরবর্তী স্তরে** অর্থাৎ **দ্বিতীয় স্তরে** আছে ঈশ্বরের নামকীর্তন, স্তব মন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদি। **তৃতীয়** স্তরে মন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদির পরিবর্তে শুরু হয় নীরব মনঃসংযোগের পর্ব। এই স্তরে ভক্তিযোগীর কাছে ঈশ্বর ছাড়া অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব মিথ্যা, ঈশ্বরবোধ ছাড়া তার অন্য কোনো বোধ থাকে না। তাঁর এই বোধ হয় তিনি আছেন এবং তাঁর অতিরিক্ত ঈশ্বর আছেন। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরে এই 'আমি' এবং 'আমার-অতিরিক্ত ঈশ্বর'-এর মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয়। ভক্তিযোগী যেন সেই স্তরে ভক্তির বিষয় ঈশ্বর হয়ে যান। এইটি হল একরকমের আন্তরদর্শন, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের এক অনুভব। সুতরাং মূর্তিপূজা, কীর্তন, ধ্যান ইত্যাদি হল ভক্তির বিভিন্ন রূপ যার মধ্য দিয়ে ভক্তিমার্গী তাঁর উপাস্যর সঙ্গে এবং কার্যত সমস্ত কিছুর সঙ্গেই এক ঐক্য বা সংহতি অনুভব করেন।

ভক্তি মানুষের সহজাত এবং ঈশ্বরলাভের উপায় হিসেবে সহজতম হলেও **ভক্তিযোগের একটি নেতিবাচক দিকের প্রতি বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।** নিজের ভক্তির বিষয়ের প্রতি বা নিজের সম্প্রদায়ের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ যতটা নিবেদিত, অন্য ব্যক্তি বা অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ সর্বদা নিবেদিত থাকে না। অন্যের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ কতটা বিরূপ এবং নির্দয় হতে পারে ইতিহাসে তার নজির আছে। তবে এই আশঙ্কায় ভক্তিযোগকে অস্বীকার করা বা তার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা অর্থহীন। কারণ, "তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম 'গৌণী'। উহা পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।"[২]

৩.৩.গ. কর্মযোগ (Karma Yoga)

কর্মযোগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, "...কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোনপ্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই হইবে উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী

১। তদেব, পৃ. ৫।

ভক্তি বা নিবেদনের **প্রেমময় মনোভাব** প্রতিটি মানুষের সহজাত। ভক্তিকে যখন যোগ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে তখন সেই ভক্তি বা নিবেদনের প্রেমময় মনোভাবটি ঈশ্বরে উদ্দিষ্ট এবং বিবেকানন্দ বলছেন, "ভক্তিযোগে এক বিশেষ সুবিধা—উহা আমাদের চরম লক্ষ্য ঈশ্বরে পৌঁছিবার সর্বাপেক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা।"[১] সাধারণত আমাদের ভক্তি বা নিবেদনের প্রেমময় মনোভাব সসীম ও নশ্বর বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে আমাদের ভালোবাসাও নশ্বর, সসীম, সৎ নয়। কিন্তু ভক্তিযোগে আমাদের ভক্তি বা প্রেম সসীম বা নশ্বর নয়। কেননা এই ক্ষেত্রে ভক্তি বা প্রেমের উদ্দিষ্ট সসীম নয়, নশ্বর নয়। এক্ষেত্রে ভালোবাসা বা ভক্তির বিষয় হল পরম সত্তা, যা অসীম এবং অবিনশ্বর (এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্র-গানের পঙ্‌ক্তি: "ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে")। এই প্রেম হল সার্বিক প্রেম, যা খণ্ডিত নয়, কোনো ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয়।

ভক্তিযোগের বিভিন্ন স্তরের কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেছেন। এই স্তর পরম্পরায় ভক্তি ঈশ্বরজ্ঞানে পরিণতি লাভ করে। **প্রথম স্তরে** ভক্তি বাহ্য কোনো বিষয়কে উদ্দেশ্য করে। সাধারণ মানুষ ঈশ্বরের সূক্ষ্ম কোনো রূপ কল্পনা করতে পারে না। তাই তার ভক্তি বা পূজার বিষয়টি হয় স্থূল। দেবতার মূর্তি কল্পনা করে, মূর্তি নির্মাণ করে সে তার উদ্দেশ্যে ভক্তি নিবেদন করে। কখনও-কখনও মানুষে দেবত্ব আরোপ করেও সে পূজা করে থাকে। মূর্তি পূজা বাহ্যবস্তুতে ভক্তি নিবেদনের সবচেয়ে জনপ্রিয় রূপ। ভক্তিযোগের **পরবর্তী স্তরে** অর্থাৎ **দ্বিতীয় স্তরে** আছে ঈশ্বরের নামকীর্তন, স্তব মন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদি। **তৃতীয়** স্তরে মন্ত্র উচ্চারণ ইত্যাদির পরিবর্তে শুরু হয় নীরব মনঃসংযোগের পর্ব। এই স্তরে ভক্তিযোগীর কাছে ঈশ্বর ছাড়া অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব মিথ্যা, ঈশ্বরবোধ ছাড়া তার অন্য কোনো বোধ থাকে না। তাঁর এই বোধ হয় তিনি আছেন এবং তাঁর অতিরিক্ত ঈশ্বর আছেন। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরে এই 'আমি' এবং 'আমার-অতিরিক্ত ঈশ্বর'-এর মধ্যে ভেদ লুপ্ত হয়। ভক্তিযোগী যেন সেই স্তরে ভক্তির বিষয় ঈশ্বর হয়ে যান। এইটি হল একরকমের আন্তরদর্শন, সর্বব্যাপী ঈশ্বরের এক অনুভব। সুতরাং মূর্তিপূজা, কীর্তন, ধ্যান ইত্যাদি হল ভক্তির বিভিন্ন রূপ যার মধ্য দিয়ে ভক্তিমার্গী তাঁর উপাস্যর সঙ্গে এবং কার্যত সমস্ত কিছুর সঙ্গেই এক ঐক্য বা সংহতি অনুভব করেন।

ভক্তি মানুষের সহজাত এবং ঈশ্বরলাভের উপায় হিসেবে সহজতম হলেও **ভক্তিযোগের একটি নেতিবাচক দিকের প্রতি বিবেকানন্দ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।** নিজের ভক্তির বিষয়ের প্রতি বা নিজের সম্প্রদায়ের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ যতটা নিবেদিত, অন্য ব্যক্তি বা অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ সর্বদা নিবেদিত থাকে না। অন্যের ভক্তির বিষয়ের প্রতি মানুষ কতটা বিরূপ এবং নির্দয় হতে পারে ইতিহাসে তার নজির আছে। তবে এই আশঙ্কায় ভক্তিযোগকে অস্বীকার করা বা তার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা অর্থহীন। কারণ, "তবে এ আশঙ্কা কেবল ভক্তির নিম্নস্তরেই আছে—এই অবস্থার নাম 'গৌণী'। উহা পরিপক্ক হইয়া পরাভক্তিতে পরিণত হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা থাকে না। এই পরাভক্তির প্রভাবে সাধক প্রেমস্বরূপ ভগবানের এত নিকটতা লাভ করেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি ঘৃণার ভাব বিস্তার করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারেন না।"[২]

৩.৩.গ. কর্মযোগ (Karma Yoga)

কর্মযোগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন, "...কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী। কর্মযোগীর কোনপ্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্তেই হইবে উহার উপলব্ধি, কারণ জ্ঞানী

১। তদেব, পৃ. ৫।

যুক্তি-বিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনপ্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।"[১]

কর্মযোগের আদর্শ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে কর্মযোগের বিশিষ্টতা আমরা নির্দেশ করতে পারি—

প্রথমত, কর্মযোগীর কাছে দেখা-শোনা-ছোঁয়ার এই জগৎটি অবাস্তব নয়, কল্পনা নয়। তাঁর কাছে যেহেতু জগৎটি বাস্তব, সেহেতু জগতে তাঁর অস্তিত্বকে ধারাবাহিক রাখার জন্য অন্যান্যদের মতো তাঁকেও কর্ম করতে হবে। কর্মযোগের সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই, কর্মযোগ সন্ন্যাস বা কর্মবিমুখতাকে উৎসাহ দেয় না। মানুষের জন্য এই জগৎটি প্রদত্ত। এই জগৎ ভিন্ন তার বসবাসের জন্য বিকল্প কোনো জগৎ নেই। কাজেই এই জগতের প্রেম ও ঘৃণার মধ্যে, ইষ্ট ও অনিষ্টের মধ্যে তাকে কালাতিপাত করে জগৎটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে এবং এজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে সমাজ ত্যাগ করলে চলবে না, তাকে নিরন্তর কর্ম করতে হবে। তাঁর পক্ষে যতদূর পর্যন্ত এবং যত ভালোভাবে সম্ভব কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই।

দ্বিতীয়ত, কর্মযোগীকে 'নিঃস্বার্থপরতা'-র সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি কাজ করবেন কোনো প্রকার আসক্তি ছাড়া। জগতে তিনি একজন আগন্তুক এরকম ভেবে তাঁকে কাজ করতে হবে যাতে কর্মের বাঁধনে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। প্রভুর মতো কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে, দাসের মতো সংশয় বা ভীতি নিয়ে নয়। নিজের স্বার্থ চিন্তা থেকে কোনো কাজ করলে ব্যক্তি কর্মের দাস হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ গীতা-র নিষ্কাম কর্মের আদর্শটির উল্লেখ করেছেন। এরকম কর্মের ক্ষেত্রে কর্তা তার কৃতকর্মের থেকে কোনো ফল প্রত্যাশা করেন না। ফলের ব্যাপারে তিনি উদাসীন, শুধুমাত্র সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্তই তিনি নিরাসক্তভাবে কাজ করে চলেন।

নিরাসক্ত কর্মের উদাহরণ হিসেবে বোধিনাভ পরবর্তী বুদ্ধদেবের কর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীর সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বোধি প্রাপ্তির পরেও বুদ্ধদেব কর্মত্যাগ করেননি। নিরাসক্তভাবে স্বার্থবুদ্ধিবিযুক্ত হয়ে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। এই কর্মের কর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বদাই দাতার, কখনোই গ্রহীতার নয়। বিবেকানন্দ বলছেন, "যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোনো অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম করেন, এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।"[২]

কর্মযোগের সাহায্যে আত্মার অপরিহার্য ধর্ম কীভাবে উপলব্ধি করা যাবে? এই প্রশ্নের যে উত্তর বিবেকানন্দ দিয়েছেন তা একাধারে সহজ এবং গভীর। তাঁর মতে অমরতার অর্থ সব কিছুর সঙ্গে একাত্মতার বোধ, অমরতার অর্থ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে বিযুক্তি। নিরাসক্ত কর্মে বন্ধন অতিক্রমণের ক্রিয়াটি সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নিঃস্বার্থ কর্মের সুবাদে চিত্ত তার বিশুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং কর্মযোগী নিজেকে সকলের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন। এই অভিন্নতার বোধই হল অমরত্বের উপলব্ধি।

৩.৩.ঘ. রাজযোগ (Raja Yoga)

বিবেকানন্দ মহর্ষি পতঞ্জলিকে রাজযোগের উদ্ভাবক বলে বর্ণনা করেছেন—"রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ 'পাতঞ্জল সূত্র'। কোনো কোনো দার্শনিক বিষয়ে মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই কার্যক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।"[৩] রাজযোগও আত্মার অমরতা উপলব্ধি করার একটি উপায়। এই উপলব্ধির জন্য রাজযোগে দেহমনকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। তবে জ্ঞানযোগী যে ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন রাজযোগীর নিয়ন্ত্রণ তা থেকে আলাদা। রাজযোগী কতিপয় দৈহিক ও মানসিক শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে এই নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন, জুন ২০০২ ; পৃ. ১০৯।

২। তদেব, পৃ. ১১৪।

৩। তদেব, পৃ. ১১৪।

যুক্তি-বিচার করিয়া বা ভক্ত ভক্তির দ্বারা যে সমস্যা সমাধান করিতেছেন, তাঁহাকে কোনপ্রকার মতবাদের সহায়তা না লইয়া কেবল কর্মদ্বারা সেই সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।"[১]

কর্মযোগের আদর্শ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বিবেকানন্দের যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ হয়েছে তা থেকে কর্মযোগের বিশিষ্টতা আমরা নির্দেশ করতে পারি—

প্রথমত, কর্মযোগীর কাছে দেখা-শোনা-ছোঁয়ার এই জগৎটি অবাস্তব নয়, কল্পনা নয়। তাঁর কাছে যেহেতু জগৎটি বাস্তব, সেহেতু জগতে তাঁর অস্তিত্বকে ধারাবাহিক রাখার জন্য অন্যান্যদের মতো তাঁকেও কর্ম করতে হবে। কর্মযোগের সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই, কর্মযোগ সন্ন্যাস বা কর্মবিমুখতাকে উৎসাহ দেয় না। মানুষের জন্য এই জগৎটি প্রদত্ত। এই জগৎ ভিন্ন তার বসবাসের জন্য বিকল্প কোনো জগৎ নেই। কাজেই এই জগতের প্রেম ও ঘৃণার মধ্যে, ইষ্ট ও অনিষ্টের মধ্যে তাকে কালাতিপাত করে জগৎটিকে বাসযোগ্য করে তুলতে হবে এবং এজন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করে সমাজ ত্যাগ করলে চলবে না, তাকে নিরন্তর কর্ম করতে হবে। তাঁর পক্ষে যতদূর পর্যন্ত এবং যত ভালোভাবে সম্ভব কাজ করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই।

দ্বিতীয়ত, কর্মযোগীকে 'নিঃস্বার্থপরতা'-র সঙ্গে কাজ করতে হবে। তিনি কাজ করবেন কোনো প্রকার আসক্তি ছাড়া। জগতে তিনি একজন আগন্তুক এরকম ভেবে তাঁকে কাজ করতে হবে যাতে কর্মের বাঁধনে তিনি আবদ্ধ না হয়ে পড়েন। প্রভুর মতো কর্তৃত্ব নিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে দৃঢ়তার সঙ্গে, দাসের মতো সংশয় বা ভীতি নিয়ে নয়। নিজের স্বার্থ চিন্তা থেকে কোনো কাজ করলে ব্যক্তি কর্মের দাস হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ গীতা-র নিষ্কাম কর্মের আদর্শটির উল্লেখ করেছেন। এরকম কর্মের ক্ষেত্রে কর্তা তার কৃতকর্মের থেকে কোনো ফল প্রত্যাশা করেন না। ফলের ব্যাপারে তিনি উদাসীন, শুধুমাত্র সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্তই তিনি নিরাসক্তভাবে কাজ করে চলেন।

নিরাসক্ত কর্মের উদাহরণ হিসেবে বোধিনাভ পরবর্তী বুদ্ধদেবের কর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। বিবেকানন্দ বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণীর সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বোধি প্রাপ্তির পরেও বুদ্ধদেব কর্মত্যাগ করেননি। নিরাসক্তভাবে স্বার্থবুদ্ধিবিযুক্ত হয়ে মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। এই কর্মের কর্তা হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল সর্বদাই দাতার, কখনোই গ্রহীতার নয়। বিবেকানন্দ বলছেন, "যিনি অর্থ, যশ বা অন্য কোনো অভিসন্ধি ব্যতীতই কর্ম করেন, তিনিই সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম করেন, এবং মানুষ যখন এরূপ কর্ম করিতে সমর্থ হইবে তখন সেও একজন বুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ভিতর হইতে এরূপ কর্মশক্তি উৎসারিত হইবে, যাহা জগতের রূপ পরিবর্তিত করিয়া ফেলিবে। এরূপ ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শের দৃষ্টান্ত।"[২]

কর্মযোগের সাহায্যে আত্মার অপরিহার্য ধর্ম কীভাবে উপলব্ধি করা যাবে? এই প্রশ্নের যে উত্তর বিবেকানন্দ দিয়েছেন তা একাধারে সহজ এবং গভীর। তাঁর মতে অমরতার অর্থ সব কিছুর সঙ্গে একাত্মতার বোধ, অমরতার অর্থ সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে বিযুক্তি। নিরাসক্ত কর্মে বন্ধন অতিক্রমণের ক্রিয়াটি সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। নিঃস্বার্থ কর্মের সুবাদে চিত্ত তার বিশুদ্ধি পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং কর্মযোগী নিজেকে সকলের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন। এই অভিন্নতার বোধই হল অমরত্বের উপলব্ধি।

৩.৩.ঘ. রাজযোগ (Raja Yoga)

বিবেকানন্দ মহর্ষি পতঞ্জলিকে রাজযোগের উদ্ভাবক বলে বর্ণনা করেছেন—"রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ 'পাতঞ্জল সূত্র'। কোনো কোনো দার্শনিক বিষয়ে মতভেদ হইলেও অন্যান্য দার্শনিকগণ সকলেই কার্যক্ষেত্রে একবাক্যে তাঁহার সাধনপ্রণালী অনুমোদন করিয়াছেন।"[৩] রাজযোগও আত্মার অমরতা উপলব্ধি করার একটি উপায়। এই উপলব্ধির জন্য রাজযোগে দেহমনকে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। তবে জ্ঞানযোগী যে ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন রাজযোগীর নিয়ন্ত্রণ তা থেকে আলাদা। রাজযোগী কতিপয় দৈহিক ও মানসিক শৃঙ্খলা প্রয়োগ করে এই নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেছেন।

১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন, জুন ২০০২ ; পৃ. ১০৯।

২। তদেব, পৃ. ১১৪।

৩। তদেব, পৃ. ১১৪।

অনেকে এরকম মনে করেন, রাজযোগ হল মুক্তির নিশ্চিততম উপায়। এই যোগ যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মুক্তিলাভ সম্ভব। এই নিশ্চয়তা এবং দ্রুততার নিরিখেই এই যোগকে 'রাজযোগ' বলা হয়েছে। **ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই যোগের অভীষ্ট। এই একত্ব অনুভবের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্ত শক্তিকে রাজযোগী অকরুণভাবে প্রতিহত করে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতাবোধের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।**

রাজযোগী মনে করেন দেহ ও মনের বিপথগামিতার কারণেই বন্ধনের সূত্রপাত। দেহ ও মন এইভাবে আত্মার শক্তি অপচয় করে এবং আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। এইজন্য দেহ এবং মনের এই বিপথগামিতার অবসান ঘটানো আবশ্যক। যদি তা সম্ভব হয় তবে আত্মার শক্তির অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে এবং শক্তিকে ঈশ্বর-অভিমুখে প্রেরণ করা যাবে। দেহ এবং মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অপরোক্ষ এবং শক্তিশালী পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই জন্য রাজযোগীকে দেহমনের একটি সুশৃঙ্খল কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়। যোগসম্মত কিছু ভঙ্গি তাঁকে নিজের শরীরে ফুটিয়ে তুলতে হয়। পতঞ্জলির দর্শনে এগুলিকে **'আসন'** বলা হয়েছে। আসনগুলির অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে যোগীকে নিশ্বাসের কিছু নিয়ন্ত্রণও, যাকে বলা হয়েছে প্রাণায়াম, আয়ত্ত করতে হবে। শরীর-মনের যে কাঠামো তা যথাযথ করা রাজযোগের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। শরীর-মনের কাঠামোতেই জীব অধিষ্ঠিত। কাজেই এই কাঠামো যদি ঠিক বা যথাযথ না থাকে তবে কোনো কাজে সাফল্য লাভ করা যাবে না। শরীর এবং মনকে আসন এবং প্রাণায়ামের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তুলতে পারলে একাগ্রতার অনুশীলন সম্ভব হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হবে। দেহ-মনে যথেষ্ট সবল না হলে, আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে, এই যোগের পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসী এবং সবল দেহমনের অধিকারী মানুষের পক্ষেই আসন ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে তুলে একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা সম্ভব।

'যোগের' চারটি পথের কথা বললেও এগুলি একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপায়। ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রবণতার ভিন্নতা অনুযায়ী নির্ভর করে কোন্ ব্যক্তি কোন্ পথ অবলম্বন করবে। উপসংহারে বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করে বলতে পারা যায়, "বেদান্ত ধর্মের মহান ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকি: কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি ব্যতীত যাহার অন্য কোনো শক্তি নাই, সে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি শেষ পর্যন্ত এই চারিটি পথই একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন-প্রণালীই আমাদিগকে সেই একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।"[১]

প্রশ্নাবলি

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন** (*Essay-type questions*) :

১। ব্যাবহারিক বেদান্ত বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতটি বর্ণনা করো। (উঃ ৩.১ সংক্ষেপে)

২। স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শটি কী? কীভাবে এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব? (উঃ ৩.২ সংক্ষেপে)

৩। জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বর্ণনা করো। (উঃ ৩.৩ক)

১। তদেব, পৃ. ১০৭।

অনেকে এরকম মনে করেন, রাজযোগ হল মুক্তির নিশ্চিততম উপায়। এই যোগ যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে পারলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে মুক্তিলাভ সম্ভব। এই নিশ্চয়তা এবং দ্রুততার নিরিখেই এই যোগকে 'রাজযোগ' বলা হয়েছে। **ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের একত্ব প্রতিষ্ঠা করাই এই যোগের অভীষ্ট। এই একত্ব অনুভবের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী সমস্ত শক্তিকে রাজযোগী অকরুণভাবে প্রতিহত করে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নতাবোধের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান।**

রাজযোগী মনে করেন দেহ ও মনের বিপথগামিতার কারণেই বন্ধনের সূত্রপাত। দেহ ও মন এইভাবে আত্মার শক্তি অপচয় করে এবং আত্মার ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। এইজন্য দেহ এবং মনের এই বিপথগামিতার অবসান ঘটানো আবশ্যক। যদি তা সম্ভব হয় তবে আত্মার শক্তির অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে এবং শক্তিকে ঈশ্বর-অভিমুখে প্রেরণ করা যাবে। দেহ এবং মনের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অপরোক্ষ এবং শক্তিশালী পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এই জন্য রাজযোগীকে দেহমনের একটি সুশৃঙ্খল কার্যক্রম অনুসরণ করতে হয়। যোগসম্মত কিছু ভঙ্গি তাঁকে নিজের শরীরে ফুটিয়ে তুলতে হয়। পতঞ্জলির দর্শনে এগুলিকে **'আসন'** বলা হয়েছে। আসনগুলির অনুষ্ঠান করার সঙ্গে সঙ্গে যোগীকে নিশ্বাসের কিছু নিয়ন্ত্রণও, যাকে বলা হয়েছে প্রাণায়াম, আয়ত্ত করতে হবে। শরীর-মনের যে কাঠামো তা যথাযথ করা রাজযোগের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের উপায়। শরীর-মনের কাঠামোতেই জীব অধিষ্ঠিত। কাজেই এই কাঠামো যদি ঠিক বা যথাযথ না থাকে তবে কোনো কাজে সাফল্য লাভ করা যাবে না। শরীর এবং মনকে আসন এবং প্রাণায়ামের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তুলতে পারলে একাগ্রতার অনুশীলন সম্ভব হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হবে। দেহ-মনে যথেষ্ট সবল না হলে, আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকলে, এই যোগের পথ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। আত্মবিশ্বাসী এবং সবল দেহমনের অধিকারী মানুষের পক্ষেই আসন ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্য করে তুলে একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা সম্ভব।

'যোগের' চারটি পথের কথা বললেও এগুলি একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপায়। ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রবণতার ভিন্নতা অনুযায়ী নির্ভর করে কোন্ ব্যক্তি কোন্ পথ অবলম্বন করবে। উপসংহারে বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করে বলতে পারা যায়, "বেদান্ত ধর্মের মহান ভাব এই যে, আমরা বিভিন্ন পথে সেই একই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারি। এই পথগুলি আমি চারিটি বিভিন্ন উপায়রূপে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া থাকি: কর্ম, ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের যেন মনে থাকে যে, এই বিভাগ খুব ধরাবাঁধা নয়, অত্যন্ত পৃথক নয়। প্রত্যেকটিই অপরটির সহিত মিশিয়া যায়; তবে প্রাধান্য অনুসারে এই বিভাগ। এমন লোক বাহির করিতে পারিবে না, কর্ম করার শক্তি ব্যতীত যাহার অন্য কোনো শক্তি নাই, সে শুধু ভক্ত ছাড়া আর কিছু নয়, অথবা যাহার শুধু জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নাই। বিভাগ কেবল মানুষের গুণ বা প্রবণতার প্রাধান্যে। আমরা দেখিয়াছি শেষ পর্যন্ত এই চারিটি পথই একই ভাবের অভিমুখী হইয়া মিলিত হয়। সকল ধর্ম এবং সাধন-প্রণালীই আমাদিগকে সেই একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়।"[১]

প্রশ্নাবলি

- **রচনাধর্মী প্রশ্ন** (*Essay-type questions*) :

১। ব্যাবহারিক বেদান্ত বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মতটি বর্ণনা করো। (উঃ ৩.১ সংক্ষেপে)

২। স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শটি কী? কীভাবে এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব? (উঃ ৩.২ সংক্ষেপে)

৩। জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বর্ণনা করো। (উঃ ৩.৩ক)

১। তদেব, পৃ. ১০৭।

৪। ভক্তিযোগ কী? ভক্তি কীভাবে মুক্তির পথ হতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে উত্তর দাও। (উঃ ৩.৩খ)

৫। "কর্মযোগ নিঃস্বার্থপরতা ও সৎকর্ম দ্বারা মুক্তি লাভ করিবার একটি ধর্ম ও নীতিপ্রণালী"—ব্যাখ্যা করো। (উঃ ৩.৩গ)

৬। স্বামী বিবেকানন্দ মহর্ষি পতঞ্জলিকে কোন্ যোগের উদ্ভাবক বলে উল্লেখ করেছেন? পতঞ্জলি উদ্ভাবিত এই যোগ কীভাবে মানুষের মুক্তির সহায়ক হতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে উত্তর দাও। (উঃ ৩.৩ঘ)

● **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** (*Short answer type questions*) :

১। স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন কেন একত্বকে বেদান্তের কেন্দ্রীভূত আদর্শ বলা হয়েছে? (উঃ ৩.১-এর অন্তর্গত)

২। ধর্মের বহুত্বকে কেন স্বামী বিবেকানন্দ অপ্রয়োজনীয় বা বর্জনযোগ্য মনে করেন না? (উঃ ৩.২-এর অন্তর্গত)

৩। বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধন করে কীভাবে বিশ্বজনীন ধর্ম বা বিশ্বধর্ম সম্ভব? (উঃ ৩.২-এর অন্তর্গত)

৪। বিশ্বজনীন ধর্ম কি এক প্রকারের ধর্ম সমন্বয় বা ধর্মের একীকরণ? (উঃ ৩.২-এর অন্তর্গত)

৫। আত্মার অমরতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ কোন উপায়ের কথা বলেছেন? এই উপায়ের বিভিন্ন প্রকারগুলি কী কী? (উঃ ৩.৩-এর অন্তর্গত)

● **সঠিক উত্তরটি বেছে নাও** (*Multiple choice questions*) : **MCQ**

১। ব্যাবহারিক বেদান্ত হল
(i) বেদান্ত দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনা (ii) বাস্তব জীবনে বেদান্ত দর্শনের প্রয়োগ
(iii) বেদান্ত দর্শনের সমালোচনা (iv) কোনোটিই নয়

২। স্বামী বিবেকানন্দ যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও পালনের কথা বলেছেন তা হল
(i) হিন্দু ধর্ম (ii) বেদান্ত ধর্ম (iii) বিশ্বজনীন ধর্ম (iv) কোনোটিই নয়

৩। আত্মার শক্তিকে একাগ্রতার বিষয় ভিন্ন অন্য সব কিছু থেকে প্রত্যাহার করার পদ্ধতিটি হল
(i) মুক্তি (ii) উপাসনা (iii) বৈরাগ্য (iv) ত্যাগ

৪। সবরকম আত্মস্বার্থপরতা থেকে মুক্ত থাকতে পারা হল
(i) ত্যাগ (ii) মুক্তি (iii) বৈরাগ্য (iv) উপাসনা

৫। স্বামী বিবেকানন্দের মতে মহর্ষি পতঞ্জলি যে যোগের উদ্ভাবক তা হল—
(i) কর্মযোগ (ii) ভক্তিযোগ (iii) রাজযোগ (iv) জ্ঞানযোগ

[উত্তর ঃ ১। (ii) ; ২। (iii) ; ৩। (iv) ; ৪। (iii) ; ৫। (iii)]